ইসলামী উপন্যাস

কুরানিক চশমা

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

প্রথম প্রকাশ:

জুমাদিউস সানী-১৪৩৮ হিজরী

মার্চ-২০১৭ ইংরেজী

প্রিন্টিং ও বাঁধাই

মুসলিম প্রিন্টার্স

দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪

মূল্যঃ ৭০ টাকা।

বাস থেকে নেমেই সজিব ঘড়ির দিকে তাকালো। বারোটা ছাড়িয়ে গেছে। মামাবাড়ি পৌঁছাতে খানিকটা পথ হাটতে হবে। তারপর পাগলু মামার সাথে দেখা হতেই কি কান্ডটা ঘটবে সেটা ভাবতেই আনন্দের দোল বয়ে যায় সজিবের মনে। তার পাগলু মামা শখের বৈজ্ঞানিক, নানা রকম মজার জিনিস তৈরী করেন। সেসব জিনিসের কোনোটিকেই অবশ্য নতুন আবিষ্কার বলা যায় না। যেহেতু বাজারে পাওয়া যায় এমন জিনিসই তিনি নিজস্ব পদ্ধতিতে তৈরী করেন। ইদুর ধরা মেশিন থেকে শুরু করে ঘরের বাল্ব, হাতের টর্চ লাইট ইত্যাদি যা কিছু পাগলু মামা ব্যবহার করেন তার সবই তার নিজের তৈরী। অনেক কষ্ট করে তিনি সেসব বানিয়েছেন। সজিব অবশ্য প্রায়ই বলে,

- মামা, এতো কষ্ট করে এসব না বানিয়ে বাজার থেকে কিনে নিলেই তো পারেন।

পাগলু মামা তখন বলেন,

- নিজের তৈরী জিনিস ব্যবহার করার মধ্যে যে কি মজা সেটা তোরা বুঝবি না।

সজিব আসলেই বোঝে না। যে জিনিস দু বিশ টাকায় বাজারে কিনতে পাওয়া যায় দু এক মাস এক নাগাড়ে পরিশ্রম করে তা কেনো তৈরী করতে হবে সেটা তার বুঝে আসে না। সে বুঝতে চায়ও না। এমনিতে সে বেশ ভালই আছে। পাগলু মামার মতো শখের বৈজ্ঞানিক হয়ে জীবনটাকে পান্তাভাতে পরিণত করার কোনো ইচ্ছা তার নেই। আহা বেচারা! নানান জিনিস আবিষ্কারের মোহে জগৎ সংসারের সকল সুখ-শান্তি পরিত্যাগ করেছেন। সারাটা দিন পশ্চিম দিকের ঘরটাতে খুট-খাট করেন। খুব ইচ্ছা ছিল বড় কিছু একটা আবিষ্কার করে বিশ্বব্যাপী নাম করবেন। কিন্তু এখন তিনি নিজের নামটাই হারিয়ে ফেলেছেন। তার নাম ছিল হাবলু। সবাই এখন তাকে ডাকে পাগলু বলে। তাদের অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। তার পাগলাটে চেহারা আর উদ্ভট আচরণের কারণেই সকলে তাকে এ নামে ডাকতে বাধ্য হয়। পাগলু মামাও তাই এখন নাম পরিবর্তনের এই বিষয়টিকে মেনে নিয়েছেন। নিজেই নিজেকে এই নামে পরিচয় দেন। আর গর্ব ভরে বলেন, বিজ্ঞানীরা পাগল টাইপেরই হয়। সজিবও তাই তাকে সব সময় পাগলু মামা বলেই ডাকে।

দেখতে দেখতে সজিব পাগলু মামাদের বাড়িতে চলে আসলো। আসার সাথে সাথেই তার নানীজান কোথা থেকে ছুটে এসে তুলকালাম কান্ড বাধিয়ে ফেললো। সজিবকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলতে লাগলো,

- ওরে আমার সাজুরে, এতো দিন কোথায় ছিলিরে .... এই সব।

এভাবে প্রাথমিক সম্ভাষন শেষ হলে তিনি তাকে হাত মুখ ধুয়ে ঘরে বসতে বললেন। সজিব হাত মুখ ধুয়ে আসলো ঠিকই কিন্তু ঘরে বসলো না। সে সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে পাগলু মামাকে খুঁজতে লাগলো। এই প্রথম তাকে পাগলু মামাকে খুঁজতে হচ্ছে। পাগলু মামাকে কখনও খুঁজতে হয় না। ময়লা আবর্জনায় আচ্ছাদিত আর ভাঙড়ি লোহা-লক্করে ভর্তি যে ঘরটিকে পাগলু মামা ল্যাবরেটরি হিসেবে আখ্যায়িত করেন সারাটাদিন তাকে সেখানেই পাওয়া যায়। সেখান থেকে সব সময় খুট-খাট হুট-হাট শব্দ শোনা যায়। একবার উঁকি দিয়ে সেখানে পাগলু মামাকে না দেখে সজিব তাই ভীষণ অবাক হয়ে গেলো। এদিক-সেদিক তাকিয়ে সে মামাকে খুঁজতে লাগলো। নানীকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে না। কারণ, নানী তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বদলে পাগলু মামার নামে নানা কেচ্ছা শুনাতে শুরু করবে, শত সহস্র অভিযোগ পেশ করবে, বারংবার মামাকে তিরষ্কার করবে আর শেষে বলবে,

- তোর পাগল মামা বুঝি আর সুস্থ হবে নারে।

কথাটা বলেই হাউমাউ করে কেঁদে ফেলবে। অতএব, পাগলু মামা কোথায় আছে তা আর জানা হবে না। এর আগে যতবার নানীর সাথে সে পাগলু মামা সম্পর্কে আলোচনা করেছে ততবার একই ঘটনা ঘটেছে। তাই নানীকে প্রশ্ন করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু বাড়ির কানা তল্লাশী করেও যখন পাগলু মামার হদিস পাওয়া গেলো না তখন অগত্যা নানীকে প্রশ্ন করতেই হলো। আর সজিবকে অবাক করে দিয়ে নানী মুচকি হেসে বললেন,

- সে তো মসজিদে গেছে, নামাজ পড়তে।

পাগলু মামা তার তথাকথিত ল্যাবরেটরী থেকে বের হয়েছে এতেই সজিব যথেষ্ট অবাক হয়েছিল। কিন্তু যখন শুনলো ল্যাবরেটরী থেকে বের হয়ে মামা মসজিদে গেছে তখন তার বিশ্ময়ের সীমা রইলো না। সে জানে তার পাগলু মামা কট্টরপন্থী নাস্তিক। ধর্ম-কর্ম তার নিকট কুসংষ্কার হিসেবেই গণ্য। ধর্মের কথা শুনলেই বিদ্রুপ করে বলেন,

- মোল্লারা কি করে না। চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, মানুষের মানহানি ইত্যাদি সবই করে। এতীমের নামে টাকা তুলে সম্পদের খনি বানায়। প্রভাবশালীদের তেল মেরে আর দূর্বলের মাথায় বেল ভেঙে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয় ইত্যাদি। অতএব তারা যে ধর্ম মেনে চলে তার মধ্যে আমি নেই।

তাছাড়া তিনি সারাটা দিন গবেষণা করে কাটান। খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজই সময়মতো করেন না। সেই তিনি কিনা নামাজ পড়তে মসজিদে গেছেন!

বিষয়টা সজিবের কিছুতেই বুঝে আসে না। সে আবারও ঘড়ির দিকে তাকায়। সাড়ে বারোটা বাজতে অল্পকিছু সময় বাকি আছে। আজ জুময়া বার। এখনই আজান হবে। অর্থাৎ পাগলু মামা আজানের আগেই মসজিদে গিয়ে হাজির হয়েছেন। এতে সজিবের বিশ্ময় হাজার গুন বেড়ে গেলো। নানীকে বলল,

- মসজিদ কোন দিকে?

শুধু কোন দিকে নয়, কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে, কখন কোন দিকে মোড় নিতে হবে এবং কতদূর পথ হাটতে হবে ইত্যাদি সকল তথ্য নানী তাকে শুনিয়ে দিলেন। সজিব তৎক্ষনাৎ রওয়ানা হয়ে গেলো। রাস্তার মাঝে আজান শুরু হয়ে গেলো। আজানের শব্দকে অনুসরণ করে সজিব সহজেই মসজিদে গিয়ে হাজির হলো।

মসজিদে গিয়ে সজিব তো অবাক। কোথাও কেউ নেই। শুনশান নিরাবতা। ভিতরে হালকা অন্ধকার। ভাল করে লক্ষ্য করতেই সজিব দেখলো এক কোনে একজন লোক বসে আছে। পোশাক-আশাক আর শরীরের গঠন দেখে পাগলু মামাই মনে হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হলো লোকটির মাথায় টুপি রয়েছে। তাই সজিবের সন্দেহ হচ্ছে সে আসলে পাগলু মামা কিনা। জীবনে সে কখনও পাগলু মামাকে টুপি পরতে দেখেনি। হঠাৎ তার মনে হলো পাগলু মামা যদি মসজিদে আসতে পারে তাহলে টুপিও পরতে পারে। এটা ভেবে সে ধীর কদমে লোকটির দিকে এগিয়ে গেলো। কাছাকাছি পৌঁছাতেই সে নিশ্চিত হলো যে, এটা তার পাগলু মামা। সে ডাকলো,

- মামা, মামা।

কয়েকবার ডাকার পরও তার মামা কোনো উত্তর দিলো না। সজিবের মনে হলো মামার কাধে হাত দিয়ে একটু ঝাকিয়ে দেবে। এই ভেবে সে পাগলু মামার কাধে হাত দিতে যাবে তখনি পিছন থেকে কেউ একজন বলে উঠলো,

- আহা! বিরক্ত করবেন না।

সজিব চমকে উঠে পিছনে তাকালো। খানিক দূরে দাড়িয়ে আছে একজন বয়স্ক লোক। গায়ে লম্বা জামা, মাথায় টুপি আর মুখে দাড়ি। সজিব অনুমান করতে পারে তিনি হয়তো এই মসজিদের মুয়াজ্জিন। তাকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে লোকটি আবার বলে,

- আল্লাহর ওলীদের ধ্যানের সময় বিরক্ত করতে নেই।

ওলী, ধ্যান এসব শব্দ সজিব এর আগেও শুনেছে। কিন্তু পাগলু মামার সাথে এসব শব্দের প্রয়োগ তার নিকট বেশ অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়। হঠাৎ তার কাছে মনে হয় এ কি তার পাগলু মামা নাকি অন্য কেউ। নিজের অজান্তেই সে বলে ওঠে,

- ইনি কে?

- উনি আল্লাহর পাগল।

সজিব যেনো আকাশ থেকে পড়ে। তার নাস্তিক মামা কিভাবে আল্লাহ পাগল হয়ে গেলো বিষয়টা সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। সে অবাক হয়ে বলে,

- আল্লাহর পাগল!

- হ্যা। প্রতি শুক্রবার মসজিদের এসে ধ্যান করেন। যিকির-আযকার করেন। কারো কোনো কথা তার কানে ঢেকে না। আশে পাশে যদি কেউ খুন হয়ে যায় তাও তিনি টের পাবেন না। এত বড় আল্লাহর ওলী তিনি।

সজিব এর আগে শুনেছে আল্লাহর ওলীরা দুর দুরান্তে কোথায় কি হয় গায়েবী ভাবে তার খবর পেয়ে যান। তাই সে ভাবে নিজের পাশে কেউ খুন হয়ে গেলেও যে টের পায় না সে আবার কেমন আল্লাহর ওলী। তখনই শোনা যায়, পাগলু মামা বিড়বিড় করে কি সব বলছে। বয়স্ক লোকটি বলে ওঠে,

- ঐ দেখুন যিকির করছে।

সজির নিজের কানটি মামার কাছাকাছি নিয়ে কি বলছে তা শোনার চেষ্টা করে। কি বলছে সম্পূর্ণ না বুঝলেও দু একটা শব্দ সজিব স্পষ্ট বুঝতে পারে। বিদ্যুৎ, তরঙ্গ, ইলেকট্রন, প্রটোন, নিউট্রন এমন কিছু শব্দ সজিবের কানে আসে। আরেকটু মনোযোগ দিয়ে শুনে সে বুঝতে পারে কোন পদার্থে কতটুকু বিদ্যুৎ তরঙ্গ আঘাত করলে কি ফলাফল হবে মামা একমনে তার হিসাব কষছেন। আর এই লোকটি মনে করছে মামা জিকির করছে। কৌতুকরে স্বরে সে বলে,

- এ কেমন জিকির! একি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জিকির!

- আল্লাহর পাগলরা কখন কি করে তা কি আর আমরা বুঝতে পারি।

বলে লোকটি মসজিদের বাইরে চলে যায়। সজিব ভাবে ঠিকই তো। তার পাগলু মামা কখন কি করে তা সে নিজেই যখন বুঝতে পারে না তখন বাইরের একজন লোক কিভাবে তা অনুমান করবে! সজিব এবার জোর করে পাগলু মামার ধ্যান ভাঙানোর চেষ্টা করে। কাধে হাত দিয়ে ভীষণ জোরে ধাক্কা দিয়ে বলে,

- মামা, এই মামা, ওই মামা।

হঠাৎ গভীর ঘুম থেকে কাউকে জাগালে যেমন ক্ষেপে যায় পাগলু মামা তেমন ক্ষেপে গেলেন। রাগের চোটে কে ডাকছে, কেনো ডাকছে সেসব খোঁজ খবর না নিয়েই চেচিয়ে বলে উঠলেন,

- গেলো রে গেলো। আমার চশমাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। কি ক্ষতি আমার হলো রে।

সজিব চারপাশে তাকিয়ে দেখলো কোথাও কোনো চশমা পড়ে আছে কিনা। কিন্তু সে কিছুই দেখতে পেলো না। এবার সে পাগলু মামার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলো মামা চশমা পরে আছে কিনা। কিন্তু মামার চোখেও সে কোনো চশমা দেখতে পেলো না। তবে স্পষ্ট দেখলো তার মামা চোখ বন্ধ করে আছেন। অর্থাৎ তিনি হয়তো স্বপ্ন দেখছেন। সে নিজেই এবার বিরক্ত হয়ে বলে,

- আরে মামা, চোখ খোলো। কোথায় তোমার চশমা?

মামা এবার চোখ খুলে সজিবের দিকে তাকালেন। বেশ কিছু দিন পর ভাগ্নেকে দেখে খুশি হওয়ার পরিবর্তে ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বললেন,

- দিলি তো আমার চশমাটার বারোটা বাজিয়ে।

সজিবের মা প্রায়ই বলে রাগী লোকের সামনে রাগ দেখাতে নেই। তাহলে রাগারাগি হয়। আর রাগারাগি থেকে মারামারি হয়। আর মারামারি থেকে খুনোখুনি হয়। খুনোখুনি জিনিসটাকে সজিব আবার খুব ভয় করে। তাই মায়ের সূত্র মেনেই সে নরম গলায় বলে,

- তোমার চশমা ভাঙেনি মামা। ভেঙেছে তোমার স্বপ্ন। বুঝেছো?

মামা এবার ধমক দিয়ে বললেন,

- আরে বোকা, ঐ স্বপ্নের মধ্যেই তো চশমাটা ছিলো। তাই স্বপ্ন ভাঙার সাথে সাথে চশমাটাও ভেঙে গেলো।

সজিব এবার তামাশার ছলে বলে,

- স্বপ্নের চশমা ভেঙেছে তাতে এত রাগের কি আছে? বাস্তবের চশমা তো আর নয়।

পাগলু মামা আবারো রেগে গিয়ে বললেন,

- রাগের কি আছে মানে? বাস্তবে কোনো কিছু তৈরী করার আগে বিজ্ঞানীরা সেটা কল্পণায় তৈরী করে তা জানিস?

সজিব মাথা ঝাকায়। সে জানে। মামা এবার সুযোগ পেয়ে বলেন,

- স্বপ্নে কোনো জিনিস তৈরী করতে না পারলে বাস্তবে তা কখনই তৈরী করা সম্ভব নয়। বহু দিন থেকে আমি একটা চশমা তৈরী করার প্লান করছি। আজ এখানে বসে চশমাটা কিভাবে তৈরী করবো তা প্রায় গুছিয়ে এনেছি আর তুই এসে সব গুলিয়ে দিলি। এটা কি ঠিক হলো?

মামার বাড়ি বেড়াতে এসে এতসব বকুনি শুনে সজিবের রেগে যাওয়া উচিৎ ছিলো। কিন্তু পাগলু মামার কথায় সে কখনও রাগ করতে পারে না। বেচারা একটা আত্মভোলা মানুষ। কখন কি বলে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কিছুটা অভিমানের স্বরে সে বলে,

- তা ঠিক হয়নি সেটা আমি মানছি। কিন্তু সদ্য বেড়াতে আসা ভাগ্নেকে যে এভাবে বকুনি দিচ্ছো সেটা কি ঠিক হচ্ছে? মাকে যদি গিয়ে নালিশ দিই তবে তোমার পিঠের চামড়া আস্ত রাখবে ভেবেছো?

ডলি আপুর কথা মনে হতেই পাগলু মামার মনে ভয়, ভালবাসা এবং হতাশা এই তিনটি অনুভূতির একটি ত্রিভূজ গঠিত হয়। নামের সাথে তার কাজের বেজাই মিল ছিল। সেই ছোট থেকে কারণে-অকারণে ডলি আপা তার কান ডলে দিতো। সেটা মনে হলে এখনও তার কানে জ্বালা করে। মাঝে মাঝে পিঠের উপরে কষে দু'চারটা চপটাঘাতও করতো। সেখানে দাগ বসে গেলে পরে তেল দিয়ে ডলেও দিতো। দুষ্টুমি করে তাই তিনি তাকে ডলি আপু না বলে ডলা আপু ডাকতেন। সেই ডলা আপুন নাম শুনে পাগলু মামা তাই নিজের পিঠের চামড়ার ব্যাপারে আসলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। চশমা ভেঙে যাওয়ার দুঃখ ভুলে তাই তিনি ভাগ্নের মন জুগানোর চেষ্টা করলেন।

- আরে সাজু যে! কখন এলি, কোথায় এলি, কেনো এলি।

পাগলু মামার কথা বলার ধরণ দেখে সাজু কিছুটা শব্দ করেই হেসে উঠলো। তারপর বলল,

- এইমাত্র এলাম, তোমাকে পেলাম, জানাই ছালাম।

কথা শুনে পাগলু মামা হিহি করে হেসে ফেলল। সজিব কোথায় যেনো শুনেছিল বিজ্ঞানীরা হাসে না কেবল গম্ভীর হয়ে থাকে। কিন্তু তার পাগলু মামা বিজ্ঞানী নয়। তিনি বই জ্ঞানী। মানে অন্য বিজ্ঞানীরা যেসব বই-পত্তর লেখে তিনি সেগুলো পড়ে জ্ঞান অর্জন করেন। তাদের থিউরীগুলো বাস্তবে পরীক্ষা করার চেষ্টা করেন। নতুন কিছুই আবিষ্কার করে না। এই কারণেই হয়তো তিনি এত সুন্দর করে হাসতে পারেন। পাগলু মামার পাগলাটে

চেহারায় এই হাসি একেবারেই মানায় না। তবে ঐ হাসি দেখেই সাজুর মনটা খুব ভাল হয়ে যায়। কেনো জানি পাগলু মামার সাথে কথা বলতে তার খুব ভালো লাগে। পাগলু মামাও তাকে পেলে কি যে খুশি হয় তা বলার না। নতুন কি কি তৈরী করেছেন সেগুলো আগ্রহ করে তাকে দেখান। সাজু সেগুলো কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখে। মামার তৈরী জিনিসগুলো দেখতে যেমন হাস্যকর হয় তার কাজও হয় হাস্যকর। সেসব দেখে-শুনে না হেসে পারা যায় না। একবার ইদুর ধরার জন্য মামা একটা ফাঁদ তৈরী করলো। সব কিছু ঠিকঠাকই ছিলো শুধু ফাঁদটা আকারে একটু বড় ছিলো। সেখানেই ঘটলো বিপত্তি। যেদিন রাতে পরীক্ষা করার জন্য ফাঁদটা পাতা হলো সেদিন সকালে দেখা গেলো ফাঁদে ইদুরের পরিবর্তে একটা বিড়াল আটকা পড়েছে। দেখে সজিব হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। সজিবের হাসি দেখে মামা ভীষণ অপমানিত হলেন। আর প্রতিশোধ স্বরুপ বিড়াল বেচারাকে এমন ধোলাই দিলেন যে সে আর বলার নয়। সেই থেকে মামা ইদুরের ফাঁদ তৈরী করা বন্ধই করে দিয়েছেন। এরপর তিনি তৈরী করেন একটা শেয়াল তাড়ানো যন্ত্র। একটা টেপ রেকর্ডারে কুকুরের ডাক রেকর্ড করে নিয়ে মুরগি ঘরের পাশে সারা রাত বাজিয়ে রাখতেন। তাতে কোনো শেয়াল পালিয়েছিলো কিনা সেটা জানা যায় নি। তবে মুরগিগুলো সব ঘর ছেড়ে পালিয়ে গাছের মাথায় রাত্রি জাপন করতে লাগলো। আর পাড়া প্রতিবেশিরা নানীর কাছে ঘুম নষ্ট হওয়ার অভিযোগ দিতে থাকলো। মামা বাধ্য হয়েই শেষে সেই যন্ত্রটি সজিবকে দান করে দেন। সজিব সেই যন্ত্রে কুকুরের ডাকের পরিবর্তে হিন্দি গান শুনতো। তাতেই সজিবের মা অভিযোগ করে বলতো,

- শেয়ালের মতো হুক্কা-হুয়া করে গান গায়। এসব কি মানুষে শোনে?

অতএব বাধ্য হয়েই সজিবকে যন্ত্রটি পরিত্যাগ করতে হলো। এমনই আরো অনেক হাস্যকর ঘটনা আছে পাগলু মামাকে দেখলেই সজিবের সেগুলো একবারে মনে পড়ে যায় আর কি যে হাসি পায়। কিন্তু হাসতে একদম মানা। মামা তাহলে ভীষণ রেগে যাবেন। নতুন কি কি জিনিস বানিয়েছেন কিছুতেই সজিবকে সেসব দেখতে দেবেন না। সেক্ষেত্রে নতুন কিছু হাস্যকর অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। তাই সজিব নিজেকে সংযত রাখে তবে এখন যেহেতু মামা নিজেই হাসছেন তাই তার সাথে তাল মিলিয়ে সজিবও একটু হেসে নিলো। হঠাৎ হাসি থামিয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে মামা বললেন,

- ছিঃ ছিঃ মসজিদে বসে এভাবে হাসতে নেই। মানুষে খারাপ বলে।

সজিব নিজেও লাজুকভাবে চারিদিকে দৃষ্টি বুলালো। মসজিদের মধ্যে এখন দুই এক জন লোক প্রবেশ করেছে বটে তবে তারা সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। কেউই তাদের দিকে তাকিয়ে নেই। তবু জোরে কথা বলা সজিবের পছন্দ হলো না। ফিস ফিস করে বলল,

- মামা তুমি মসজিদে এসেছো কেনো বলো তো?

মামা পাগলাটে ধরনের একটা হাসি হেসে বললেন,

- আরে পাগর মাসজিদে আবার মানুষ কি জন্য আসে? নামাজ পড়তে।

সজিব এবার হালকা শব্দ করে হেসে ফেলে। তারপর আবার এদিক সেদিক দৃষ্টি বুলিয়ে বলে,

- তুমি তো নাস্তিক। তুমিও নামাজ পড়ো?

পাগলু মামা এবার প্রশ্নের প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন। গম্ভীরভাবে বলেন,

- শুক্রবার হলেই তোর নানী এমন জ্বালাতন শুরু করে যে, বাড়িতে টেকা যায় না। সেই সকাল বেলা থেকে কেবলই বলে, এই হাবু গোসল করে মসজিদে যা, মসজিদে যা। এতে আমার গবেষণা কর্ম দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। আমি তাই প্রতি শুক্রবার খুব সকালে গোসল করে টুপি মাথায় দিয়ে মসজিদে চলে আসি। মসজিদের এক কোনে বসে যতসব গবেষণার বিষয়ে ভাবতে থাকি। এই যেমন আজ একটা চশমা তৈরী করার ব্যাপারে ভাবছিলাম। মানুষ মনে করে আমি যিকির-আযকার করছি তাই কেউ কোনো বিরক্ত করে না। এটা এক রকম ভালোই। এখন ভাবি প্রতিদিন শুক্রবার হলেই বোধ হয় ভালো হতো। প্রতিদিন মসজিদে এসে ধ্যানে বসতে পারতাম।

সজিব হেসে বলে,

- মসজিদে আসার জন্য প্রতিদিন শুক্রবার হওয়ার কোনো দরকার নেই মামা। যে কোনো দিনই তো মসজিদে আসা যায়।

মামা অবাক হয়ে বললেন,

- তাই নাকি! আমি তো ভেবেছিলাম শুক্রবার ছাড়া অন্য দিন মসজিদ খোলেই না।

কথাটা অন্য কেউ বললে সজিব অবশ্যই বিশ্বাস করতো না কিন্তু তার পাগলু মামার ব্যাপারটা আলাদা। দুনিয়ার কোনো ব্যাপারেই তার কোনো আগ্রহ নেই কোথায় কি হচ্ছে সে ব্যাপারে কোনো খোঁজ খবরও তিনি রাখেন না। অতএব শুক্রবার ছাড়াও যে মসজিদ খোলে এটা তার জানা নাও থাকতে পারে। সজিব তার মামাকে আরও একটা প্রশ্ন করতে

যাচ্ছিলো কিন্তু তখনই কেউ একজন কড়া গলায় কিছু একটা পাঠ করতে শুরু করে। শব্দের উৎসের দিকে তাকাতেই সজিব দেখলো মোটা সাইজের একজন হুজুর মিম্বারের উপর বসে আরবী দোয়া দরুদ পাঠ করছেন। সে বুঝতে পারে ইনিই এই মসজিদের ইমাম সাহেব। এখন জুময়ার খুতবা দেবেন। এ সময় কথা বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তাই সে চুপ হয়ে গেলো।

ইমাম সাহেব দোয়া দরুদ পড়া শেষ করে উপস্থিত মুছল্লীদের সালাম দিয়ে মূল আলোচনা শুরু করলেন।

- ভাই সব, ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম এখানে অশান্তির কোনো স্থান নেই। যে বা যারা অশান্তি করে তাদের হেলিকপ্টারে করে নিয়ে গিয়ে বঙ্গপোসাগরে ফেলে দিতে হবে। দাতাল হাঙররা তাদের চিবিয়ে খাবে।

কথাটা শুনেই উপস্থিত মুছল্লীরা কক কক করে হেসে উঠলো। ইমাম সাহেব নিজেও হাসলেন। পান খেয়ে লাল করা দাতগুলো দেখে মনে হচ্ছিলো তিনি নিজেই দাতাল হাঙরদের একজন সদস্য।

তখনই মসজিদে কোনো একজন নামী-দামী ব্যক্তি হাজির হলে ইমাম সাহেব দুহাত উঁচু করে ডাকলেন,

- চেয়ারম্যান সাহেব সামনে আসুন। এই যে, এখানে।

সজিব দেখলো একটা রোগা-পটকা লোক সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনিই নিশ্চয় চেয়ারম্যান সাহেব। ইমাম সাহেব দুটি হাত তার দিকে এমনভাবে বাড়িয়ে রয়েছেন যেনো তিনি ঐ লোকটির মা। কাছে আসলেই তাকে কোলে তুলে নেবেন। ইমাম সাহেব পারলে হয়তো তাই করতেন। কিন্তু বয়ষ্ক লোককে কোলে তুলে নিলে বিসয়টা হাস্যকর হয় বলেই হয়তো তিনি এ কাজ থেকে দূরে থাকেন। লোকটি সামনে আসলে ইমাম সাহেব তাকে সযত্নে সামনের কাতারে বসালেন। তারপর লাল দাতগুলো আবার বের করে বললেন,

- ভাল আছেন?

লোকটি ভীষণ তাচ্ছিল্যের সহিত হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলে ইমাম সাহেব আবারও শুরু করলেন,

- ইসলাম জঙ্গীবাদকে সমর্থন করে না। মানুষ মারা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। রক্তপাত ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ .....

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ইমাম সাহেব বক্তৃতা দিতে থাকলেন। ইনিয়ে বিনিয়ে নানা কথা নানা কাহিনী বলে চললেন তিনি। এতগুলো লোক ধৈর্য ধরে তার কথা কিভাবে শুনছে সেটা ভেবে সজিব অবাক হলো। সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো উপস্থিত কেউই তার কথায় কর্ণপাত করছে না। কেউ তো অবচেতন অবস্থায় আছে আর কেউ আছে আধাচেতন অবস্থায়। সজিব বুঝে নিলো ইমাম সাহেব চিবিয়ে চিবিয়ে যতক্ষণ বয়ান করবেন তাকে ততক্ষণ ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে মসজিদেই কাঁটাতে হবে। উপস্থিত সবার সাথে তাল মিলিয়ে সে তাই ঝিমাতে শুরু করলো। মাঝে মাঝে চোখ খুলে সে একবার ঘড়ির দিকে আর একবার হুজুরের দিকে তাকাচ্ছিল। হুজুর তখনও পূর্ণ উদ্দোমে বয়ান দিয়ে চলেছেন। বোঝায় যাচ্ছে এক সপ্তাহ বাদে পাওয়া সুযোগটা তিনি হেলায় হারাবেন না।

হুজুর সেই একই রকম বয়ান দিয়ে চলেছেন। কাফির মুশরিক কাউকে কোনো আঘাত করা যাবে না, রক্তপাত করা যাবে না ইত্যাদি। একই কথা বারংবার শুনে সজিবের মনটা বিরক্ত হয়ে উঠলো। ইচ্ছা হলো লোকটার মুখে চটাম করে একটা চড় কষিয়ে দিই। কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব নয় তাই আবারও চোখ বুঝে সে ঝিমুতে থাকলো। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সে কেবলই ভাবছিল যদি কেউ হুজুরের মুখে সত্যি সত্যি একটা চড় কষিয়ে দিতো তবে চটাম করে একটা শব্দ হতো। শব্দটা শুনে সজিবের বিরক্ত মনটা বড্ড শান্তি পেতো। ঠিক তখনই সজিব চটাম করে একটা শব্দ শুনতে পেলো। ভীষণ অবাক হয়ে চোখ খুলতেই সে বুঝতে পারলো, তার ইচ্ছা পুরোপুরি না হলেও অনেকাংশে পুরা হয়েছে। অন্য কেউ নয় হুজুর নিজেই নিজের মুখে বেশ জোরে একটা থাপ্পর কষিয়ে দিয়েছেন। একটা পাজি মশা বসেছিল তার চোয়ালে। মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিনামূল্যে খাবার খেয়ে তিনি যে বিশাল শরীর বানিয়েছেন সেই শরীর থেকে অল্প কিছু রক্ত মশাটি চোষণ করেছে। এই তার অপরাধ। এই অপরাধে হুজুর মশাটির উপর চপটাঘাত করেছেন। তাতে যে কেবল মশা বেচার প্রাণপাত হয়েছে তাই নয় সেই সাথে কিছু রক্তপাতও ঘটেছে। হুজুরের চোয়ালের উপর রক্তের লাল দাগ বসে রয়েছে। রক্তপাত করা যাবে না বলতে বলতে হুজুর নিজেই রক্তপাত ঘটিয়ে ফেলেছেন। ঘটনা দেখে সজিব মুচকি হেসে আবার ঝিমুতে শুরু করে। ঝিমাতে ঝিমাতে সে ভাবে এই মশার রক্তপাত ঘটানোটা কি অপরাধ নয়? পরে নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে। অপরাধ হবে কেনো? যে নিজেই অন্যের রক্ত চুষে খায় তাদের রক্তপাত ঘটানো কি অপরাধ হতে পারে! এ হিসেবে সমাজে যারা অন্য মানুষের রক্ত ও সম্পদের উপর আঘাত হানে তাদের রক্তপাত ঘটানোও কি বৈধ? চোর-ডাকাতে মানুষ খুন করে, এম,পি মন্ত্রীরা মানুষ গুম করে, মানুষের উপর জুলুম করে মানুষের রক্ত চুষে খায়। একটা মশার মতো তাদের

পিষে ফেললে কি কোনো অপরাধ হয়? ইসলামে রক্তপাত নেই তবে বদরের ময়দানে কেনো যুদ্ধ হয়েছিলো?

সজিবের মনের মধ্যে এই সব প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে। পাগলু মামার মতো তারও মাঝে মাঝে পাগলা খেয়াল চেপে যায়। কোনো বিষয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি হলে সেটার উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত সে স্থির হতে পারে না। দিন রাত যাকে তাকে ধরে সে কেবলই প্রশ্ন করতে থাকে। তখনই সজিবের কানে আসে ইমাম সাহেব বলছেন,

- ইসলাম সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে বলে।

সজিব আবার চিন্তায় পড়ে যায়। শ্রদ্ধা করতে বলে, তাহলে ইব্রাহীম ﵇ কেনো মূর্তি ভাঙলেন? রসুলুল্লাহ ﷺ কেনো কা'বা শরীফে রাখা ৩৬০ টি মূর্তি ভেঙে দেন? এসব কাহিনী তো হুজুররাই বলে। তবে কি এসব কাহিনী মিথ্যা! নাকি ইসলাম অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা সম্মান করতে বলে এই কথাটি মিথ্যা?

হুজুরের বাকী বক্তব্যের মধ্যেও এরকম আরো কিছু প্রশ্ন সজিবের মনে বাসা বাধে। এই প্রথম ইসলাম সম্পর্কে তার জানার ইচ্ছা হয়। হুজুররা ইসলাম সম্পর্কে নানা রকম কথা বলে। তার মধ্যে কোনটি সঠিক তা জানার জন্য তার মনটা ভীষণ আগ্রহী হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ইমাম সাহেব বাংলা বয়ান শেষ করেন। সজিব ভেবেছিলো কাজ হয়তো শেষ। কিন্তু তার ধারনা ভুল প্রমাণিত করে ইমাম সাহেব উপস্থিত মুছল্লীদের নিকট টাকা কালেকশন করতে শুরু করলেন। এতে যতটুকু সময় ধরে বক্তব্য দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি সময় লেগে গেলো। পরে আরবী খুতবা হলো এবং জুমুয়ার নামাজ হলো।

নামাজ শেষে পাগলু মামার সাথে বাড়ি ফেরার পথে এবং বাড়ি ফিরে আসার পরও সজিবের মনের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উকিঝুকি দিতে শুরু করলো। সে জানে পাগলু মামা এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারবে না। তিনি কেবলই বিজ্ঞান নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন। এর বাইরে জগতে আর কি আছে সেটা তিনি জানেন না। তবু হাতের কাছে কাউকে না পেয়ে সে তার পাগলু মামার সাথেই প্রশ্নগুলো খুলে বলল।

- কেউ বলে ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলামে কোনো রক্তপাত নেই। আবার কেউ ইসলামের নামে জিহাদ করে রক্তপাত ঘটায়, অশান্তি সৃষ্টি করে। কোনটি সঠিক? কেউ বলে, ইসলাম অন্য সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা-সম্মান করতে বলে আবার কেউ বলে মূর্তি ভেঙে ফেলতে হবে। অন্য সকল ধর্মকে ধ্বংস করে দিতে হবে। এর মধ্যে কোনটি সঠিক?

পাগলু মামা তার প্রশ্নগুলোকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেন। পাগলের মতো হেসে বলেন,

- আমি একজন নাস্তিক। আমার দৃষ্টিতে ইসলামসহ সকল ধর্ম ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিৎ।

কথাটা বলে তিনি হি হি করে হাসতে লাগলেন।

সজিব এই কথার মধ্যে হাসির কিছু খুঁজে পেলো না। তাই পাগলু মামাকে একরকম ধমক দিয়ে বলল,

- তোমার মতামত কে জানতে চেয়েছে? আমি বলছি ইসলামের দৃষ্টিতে কোনটি সঠিক?

পাগলু মামা এবার রেগে গেলেন,

- ইসলামের দৃষ্টিতে কোনটি সঠিক সেটা আমি কিভাবে বলবো? আমি কি হুজুর? এসব জানতে চাইলে কোনো মোল্লাকে প্রশ্ন করগে।

মামাকে কিছুটা শান্ত করার চেষ্টা করে সজিব বলে,

- মোল্লারা একেক জন একেক কথা বলে, সেকারণেই তো বুঝতে পারি না কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক। কোন হুজুর সত্য বলে আর কে মিথ্যা বলে?

কথাটা বলেই সজিব হঠাৎ করে ভীষণ জোরে পাগলু মামার কাধ ঝাকিয়ে বলে,

- তুমি একটা ব্যবস্থা করো না মামা।

পাগলু মামা যেনো আকাশ থেকে পড়লো।

- আমি এর কি ব্যবস্থা করবো?

সজিব এবার বিষয়টি বুঝিয়ে বলে,

- মনে আছে, একবার তুমি ইদুর ধরা যন্ত্র তৈরী করেছিলে।

- হ্যাঁ বেশ মনে আছে। তো তাতে কি হয়েছে?

- তুমি অমন একটা মেশিন তৈরী করতে পারো না যাতে মিথ্যাবাদী হুজুররা ধরা পড়ে। হুজুরদের প্রকৃত রুপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তাহলে আমরা জানতে পারবো কার কথা ঠিক আর কার কথা ভুল।

সজিবের কথা শুনে পাগলু মামা নিরব হয়ে গেলেন। তিনি নিজেও গত কয়েকদিন থেকে এমন একটা যন্ত্র তৈরী করার কথা ভাবছেন। ঠিক হুজুর ধরার যন্ত্র নয়, মানুষের প্রকৃত রুপ নির্ণয় করার যন্ত্র। তিনি শুনেছেন, প্রতিটি মানুষের মাঝে পশুত্ব লুকিয়ে আছে। প্রকৃত মানুষ খুব কমই আছে। মানুষ রুপের এসব পশুদের তিনি প্রকাশ করে দিতে

চান। এ উদ্দেশ্যে তিনি একটা চশমা তৈরী করার কথা ভাবছেন। যা চোখে দিয়ে ঘুরলে কোন মানুষের ভিতরে পশুত্ব লুকিয়ে আছে তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। কাউকে গরু-ছাগল আর কাউকে শেয়াল-কুকুরের রুপে দেখা যাবে। এভাবে মানুষ রুপের আড়ালে কে প্রকৃত পশু সেটা নির্ণয় করা যাবে। বিষয়টা ভাবতেই তার বেশ মজা লাগে। তিনি চশমা চোখে দিয়ে হাটছেন আর চারিপাশে মানুষের বদলে নানা রকম দোপেয়ো পশু দেখা যাচ্ছে এটা কল্পণা করতেই তার ভালো লাগে। বেশ কিছুদিন থেকে তাই তিনি এই চশমাটি তৈরী করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সব কাজই প্রায় সমাধা করে ফেলেছেন কেবল একটি কাজ বাকী। একটা প্রশ্ন তার মাথায় কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। পশুত্বের সংজ্ঞা কি হবে? প্রতিটি মানুষের দৃষ্টিতে সে প্রকৃত মানুষ আর অন্য সবাই মানুষ রুপে পশু। রাস্তা-ঘাটে প্রায়ই দেখা যায় অনেক মানুষ একে অপরকে গরু-গাধা, শেয়াল-কুকুর, হিংস্র-হায়েনা ইত্যাদি নানা নামে আখ্যায়িত করে। এভাবে একজন আরেকজনকে একটা পশু নাম দিয়ে দিলেই কিন্তু কেউ তা মেনে নেয় না বরং পাল্টা সেও আরেকটা গাল শুনিয়ে দেয়। এভাবে তো সমাধান হতে পারে না। কে প্রকৃত মানুষ আর কে মানুষ রুপের পশু এমন একটা সংজ্ঞার আলোকে তা নির্ণয় করতে হবে যা সবাই মেনে নিতে বাধ্য হয়। এমন একটা ব্যক্তির কথা থেকে সেই সংজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে যিনি পশু বললে স্বয়ং যাকে পশু বলা হচ্ছে সেও মেনে নিতে বাধ্য হয়। পাল্টা কিছু বলতে না পারে। কিন্তু সেটা কি হতে পারে।

- ইউরেকা।

পাগলু মামা হঠাৎ চেচিয়ে ওঠেন। ঘটনা বুঝতে না পেরে সজিব চমকে ওঠে।

- উইপোকা? কোথায় উইপোকা?

তার কথা শুনে মামা বিরক্ত হয়ে বললেন,

- আরে পাগল ইউরেকা মানে জানিস না?

এবার সজিব বিষয়টা বুঝতে পারে। কোনো এক পাগলা বিজ্ঞানী কি একটা আবিষ্কার করে ইউরেকা বলতে বলতে উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়েছিলো। সেই কাহিনীটা তার মনে পড়ে। ভাগ্য ভালো যে মামা এতটা করেননি। কেবল মুখে শব্দটা উচ্চারণ করেছে। কিন্তু মামা এমন কি আবিষ্কার করলো যার কারণে জটিল ও কঠিন শব্দটা তাকে উচ্চারণ করতে হলো?

- সমাধান হয়ে গেছে, বুঝলি? কেল্লা ফতেহ হয়ে গেছে।

কার কেল্লা কে ফতেহ করলো সেটা সজিব কিছুতেই বুঝতে পারে না। কেবল হা করে পাগলু মামার দিকে তাকিয়ে থাকে। মামা হেয়ালী করে বলেন,

- বুঝলি না তো। আয় তোকে বুঝিয়ে দিই।

কথাটা বলে পাগলু মামা তার চশমাটা কিভাবে তৈরী করা হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা শুরু করলেন। সেসব কথার আগা মাথা কিছুই সজিবের মাথায় ঢুকলো না। কেবল বোঝা গেলো চমশাটার কোথাও মামা কুরআন শরীফ ঢুকিয়ে দেবেন। অতএব, কুরআনের বক্তব্য মতে কার প্রকৃত রুপ কি সেটা ঐ চশমা যার চোখে থাকবে সে দেখতে পাবে। একারণে চশমাটির নাম দেওয়া হবে কুরানিক চশমা। আর কিছু না বুঝলেও সজিব এতটুকু বুঝতে পারে যে, এতে তার উদ্দেশ্য সফল হবে। হুজুররা যখন বক্তব্য দেবে সজিব এই চশমাটি নিয়ে বক্তব্য শুনতে হাজির হবে। মিথ্যা কথা বললে নিশ্চয় তার রুপ পরিবর্তিত হবে। তাতেই বোঝা যাবে কে মিথ্যাবাদী আর কে সত্যবাদী। অতএব সজিব এমন একটি চশমার ব্যাপারে ভীষণ আগ্রহী হয়ে ওঠে।

- ঠিক আছে মামা তাড়াতাড়ি চশমাটা তৈরী করে ফেলো।

পাগলু মামা নিরব থাকেন। কোনো কথা বলেন না। অর্থাৎ তিনি আজই চশমাটি তৈরী করবেন। তিনি কথায় নয় কাজে বিশ্বাসী।

সেদিন রাতে সজিবের ভালো ঘুম আসলো না। পাগলু মামা তো ঘুমাতেই গেলো না। সারা রাত কেবলই খুট খাট করে কি সব কাজ করতে লাগলো। সকালে ঘুম থেকে উঠে সজিব সোজা চলে গেলো মামার ল্যাবরেটরীতে। গিয়ে সে যা কান্ড দেখলো তাতে তার হেসে আটখানা হয়ে যাওয়ার কথা। দেখলো, তার পাগলু মামা একটা বিশাল চশমা পরে রয়েছে। চশমাটার আকৃতি অনেকটা ভোটের চশমার মতো। ভোটের সময় কারো মার্কা যদি চশমা হয় তবে যেমন বিশাল একটা চশমা তৈরী করে রাস্তা ঘাটে টাঙিয়ে রাখে পাগলু মামার চশমাটা তার কাছাকাছি। তবু অনেক কষ্ট করে মামা চশমাটা চোখে পরে রয়েছেন। তাকে যে কি উদ্ভট লাগছে তা বলার নয়। সজিবকে দেখেই মামা বললেন,

- কি কেমন হয়েছে চশমাটা?

সজিব কি বলবে কিছুই ভেবে পেলো না। আমতা আমতা করে বলল,

- ভালোই হয়েছে। মানে, ভালোই বড় হয়েছে। সাইজটা একেবারেই বেখাপ্পা। এইটা পরে রাস্তা-ঘাটে হাটলে সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাবে আর হাসবে।

সজিব ভেবেছিল কথাটা শুনে পাগলু মামা ভীষণ রেগে যাবে। রেগে গিয়ে চশমটা হয়তো ভেঙেও ফেলতে পারে। তার মতো শখের বিজ্ঞানীরা মানুষের নিকট দু একটা ভালো কথা শোনার জন্য নানান জিনিস তৈরী করে। কেউ সেসব জিনিসকে প্রসংশা করলে তারা খুশি হয় কিন্তু কেউ যদি সমালোচনা করে তবে খুব মনোক্ষুন্ন হয়। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখলো তার কথা শুনে পাগলু মামা ভীষণ খুশি হলেন। খুশিতে নিজের দাঁতগুলো প্রকাশিত করে বললেন,

- সত্যি বলছিস? তাহলে তো অনেক কষ্ট কমে যাবে।

সজিব অবাক হয়ে বলে,

- কষ্ট কমে যাবে?

- হ্যাঁ। চশমাটার নিয়মই হলো কোনো ব্যক্তি যখন এর দিকে তাকাবে তার চোখের ভিতর দিয়ে এক প্রকার রশ্মি ঢুকে মস্তিষ্ক থেকে তার সারা জীবনের কর্মকান্ড সম্পর্কে একটা তথ্য চশমার মেমোরীতে লোড হবে। তখনই না চশমাটা বলতে পারবে ঐ ব্যক্তি আসলে মানুষ নাকি পশু। কিভাবে রাস্তায় বের হয়ে আমার চশমার দিকে সকল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় আমি তো কখন থেকে সেই চিন্তাই করছি। শেষে ভেবে-চিন্তে একটা সিদ্ধান্তও নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম চশমাটা পরে নায়িকাদের মতো নাচতে নাচতে রাস্তা দিয়ে হাটবো। যাতে সবাই আমার দিকে তাকায়। কিন্তু তুই বলছিস এমনিতেই সবাই চশমার দিকে তাকাবে। তাহলে আর এত কষ্ট আমার করা লাগবে না।

মামার কথা শুনে সজিব হিহি করে হেসে উঠে বলে,

- ঠিকই বলেছি মামা, মোটেও নাচার দরকার হবে না। ঐ সু-বিশাল চশমাটা তোমার চোখে পরলেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যথেষ্ট হবে।

কথাটা শুনে মামা আশ্বস্ত হলেন এবং খুটিয়ে খুটিয়ে চশমাটা দেখতে লাগলেন। সজিব কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করে,

- চশমার কাজ কি শেষ মামা?

- প্রায় শেষ।

সজীবের যেনো আর তর সইছে না। সে অধৈর্য হয়ে বলে,

- কখন শেষ হবে?

- প্রায় বছর খানেক লেগে যাবে মনে হয়।

মামার কথা শুনে সজিব ধাঁধাঁর মধ্যে পড়ে যায়।

- এই বলছো প্রায় শেষ আবার বলছো এক বছর লাগবে। এটা কেমন কথা।

পাগলু মামা স্বাভাবিকভাবে বলেন,

- কথা ঠিকই আছে। প্রায় শেষ মানে অল্প একটু বাকি আছে। আর এই বাকিটুকু শেষ করতে এক বছর লাগবে। বুঝেছিস?

সজিব কিচ্ছু বুছলো না। বেশিটুকু যখন এক রাতে হয়ে গেলো তখন বাকিটুকু কেনো বছর খানেক লাগবে সেটা সে বুঝতে পারলো না। বুঝার চেষ্টা করেও লাভ নেই। তার মামা একটা সহজ সরল বিষয়কেই জটিল করে ফেলে। অতএব এমন জটিল বিষয়ের কোনো সহজ সরল উত্তর দিতে পারবে না তা বলাই বাহুল্য। অতএব, একটু আশাহত হয়ে সজিব বলে,

- একটু আগে শেষ করা যায় না?

মামা গম্ভীরভাবে বলেন,

- সেটা নির্ভর করে তোর নানীর উপর।

- আমার নানী মানে?

সজিব যেনো আকাশ থেকে পড়ে।

পাগলু মামা কৌতুক করে বলেন,

- তোর নানী মানে আমার মা।

সজিবের মাথায় বিশাল জট পাকিয়ে যায়।

- আমার নানী মানে তোমরা মা আবার কবে থেকে বিজ্ঞানী হলো?

মামা স্বাভাবিকভাবে বলেন,

- বিজ্ঞানী নয় তবে কুরানী তো বটে?

সজিব অবাক হয়ে বলে,

- কুরানী আবার কি?

মামা হালকা হেসে বলেন,

- কুরআন পড়তে পারেন যিনি তিনিই কুরানী।

সজিবও হেসে বলে,

- তা কুরানীর কাজটা কি শুনি?

মামা আবার গম্ভীর হয়ে যান।

- বললাম না, আমার এই চশমায় কুরআন ঢুকিয়ে দবো। যাতে কুরানের আলোকে মানুষের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হয়।

সজিব এবার বুঝে ফেলার ভান করে বলে,

- তা বলেছো বটে। কিন্তু তার সাথে নানীর কি সম্পর্ক?

- এই চশমার মধ্যে কুরআন প্রবেশ করাতে হলে চশমাটা চোখে দিয়ে ৩০ পারা কুরআন পাঠ করতে হবে। আমি তো আর কুরআন পড়তে পারি না তাই ভেবেছি তোর নানীকে দিয়ে পড়িয়ে নেবো?

সজিব এবার পুরো বিষয়টি বুঝতে পারে। সেই সাথে এটাও বুঝতে পারে যে তার মামা মারাত্মক ভুল একটা তথ্য দিয়েছেন। নানীকে দিয়ে ত্রিশ পারা কুরআন পড়াতে হলে এক বছর নয় বরং একটা জনম লেগে যাবে। তাছাড়া ঐ বিশালায়তন চশমা চোখে দিয়ে নানী এক মিনিটও কুরআন পড়বেন কিনা তা নিয়ে ব্যাপক সন্দেহ রয়েছে। অতএব, নানীকে দিয়ে কুরআন পড়ানোর চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলাই সঙ্গত। মামাকে বিষয়টা বলতেই তিনি এর সত্যতা স্বীকার করলেন এবং সাথে সাথেই হতাশ হয়ে বললেন,

- তাহলে তো আমার কুরানিক চশমা আর তৈরী করা যাবে না রে।

কথাটা বলে অনেকটা মা মরা ছেলে বা ছেলে মরা মা যেভাবে দুঃখ করে পাগলু মামা তেমনভাবে মুখ গোমড়া করে বসে থাকলেন। সজিব নিজেও কম দুঃখ পেলো তা নয়। এত বড় একটা আবিষ্কার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে থেমে যাবে এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। মগজের সম্পূর্ণ ঘিলু কাজে লাগিয়ে সে এর একটা সমাধান বের করার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ নিরব থেকে হঠাৎ চিৎকার করে বলে ওঠে,

- ইউরেকা।

কথাটা শুনে পাগলু মামা ভিষণ অবাক হয়ে এদিক সেদিক তাকাতে থাকেন। তিনি ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ এই শব্দটি বলে না। মিনিটে মিনিটে তিনিই বারবার শব্দটি উচ্চারণ করে থাকেন। প্রথম দিকে তিনি ইউরেকা বলে চিৎকার করতেই তার মা ঝাঁটা নিয়ে ছুটে আসতেন। বলতেন,

- দেখি, কোথায় উইপোকা ঝাটা দিয়ে পিটিয়ে ভর্তা বানিয়ে দিই।

পাগলু মামা তখন মাকে কোনোমতে বুঝিয়ে শুনিয়ে বিদায় করতেন। এখনও ইউরেকা বলার পর মাঝে মাঝে তিনি শুনতে পান মা বলছে,

- এই খোকা। বারেবারে উইপোকার কথা কেনো বলিস? হায় আল্লাহ! পাগল ছেলেটা কি আরও পাগল হয়ে যাচ্ছে?

অতএব শব্দটি কে করলো মামা সে বিষয়ে গভীরভাবে ভাবলেন। শেষে যখন বুঝতে পারলেন তার প্রাণপ্রিয় ভাগ্নেই শব্দটি উচ্চারণ করেছে এবং সে এর অর্থও বোঝে। তখন কৌতুহলী হয়ে বললেন,

- কি কোনো সমাধান পেলি?

- পেয়েছি মানে আলবাত পেয়েছি। অল্প সময়ে এবং অল্প খরচে এ সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব।

অল্প সময়ে সমস্যা সমাধানের কথা শুনে পাগলু মামা আসলেই ভিষন অবাক হলেন। সজিবের দিকে তাকিয়ে বললেন,

- কি ব্যাপার, বল দেখি।

সজিব বিষয়টি মামাকে বুঝিয়ে দেয়।

- হাফেজরা পাড়ায় পাড়ায় কুরআন খতম দিয়ে বেড়ায়। কয়েক ঘন্টায় তাদের খতম দেওয়া হয়ে যায়। তাদের দিয়ে কুরআন পড়িয়ে নিলেই তো হয়। কিছু টাকা খরচা হবে ঠিকই কিন্তু কাজটা অনেক কম সময়ে হয়ে যাবে।

পাগলু মামা এবার বিষয়টি বুঝতে পারেন। তিনি জগতের আর কোনো ব্যাপারে খোঁজ খবর না রাখলেও কুরআন খতমের বিষয়ে ভালোই খোঁজখবর রাখেন। যেদিন থেকে তিনি বিজ্ঞান সাধক হয়েছেন তার মা ভেবেছে তিনি পাগল হয়ে গেছেন। তার উপর হয়তো দৃষ্টির ভাব হয়েছে। সেই থেকে বছরে দু এক বার তাদের বাড়িতেই কুরআন খতমের অনুষ্ঠান হয়। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই কুরআন খতমের অনুষ্ঠান শেষ হয়। হাফেজরা পেট পুরে খাওয়া-দাওয়া করে চলে যায়। তিনি শুনেছেন তার মা নাকি তাদের কিছু টাকা পয়সাও দেয়। কিন্তু কত টাকা দেয় তা তিনি শোনেননি। ইচ্ছা করলেই তিনি তার মাকে দিয়ে এখনই এমন একটা অনুষ্ঠান করতে পারেন। তাতে তার নিজের কোনো খরচ-খরচা করতে হবে না। নিজের অজান্তেই তিনি বলে ওঠেন,

- ইউরেকা, মা ইউরেকা।

তার কথা শুনে তার মা ঝাটা নিয়ে ছুটে আসেন,

- কোথায় উইপোকা, দেকি ঝাটা দিয়ে পিটিয়ে সমান করে দিই।

নানীকে ঝাটা নিয়ে ছুটে আসতে দেখে সজিব প্রথমে ভয় পায় পরে ভীষণ জোরে হেসে ওঠে। তাকে হাসতে দেখে নানী বলেন,

- এই মুখ পোড়া হাসছিস কেনো?

সজিব হাসতে হাসতে বলে,

- তুমি যেভাবে ঝাটা নিয়ে উইপোকা মারতে আসছো তাতে মনে হচ্ছে উইপোকা ভুত পেত্নী বা রাক্ষস টাইপের কোনো প্রাণী।

নানী এবার ভীষণ রেগে বলেন,

- সেটা ঐ হতচ্ছাড়াকে বোঝা। উইপোঁকা কি রাক্ষস যে উইপোঁকা দেখে এভাবে চিৎকার করতে হবে।

সজিব নানীকে বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করে। ইউরেকা আসলে উইপোকা নয়। কোনো এক মহান বিজ্ঞানী উলঙ্গ হয়ে গোসল করতে করতে কি একটা বিষয় আবিষ্কার করেন। তাতে খুশি হয়ে তিনি কাপড় না পরেই ইউরেকা বলতে বলতে রাজার দরবারে হাজির হয়েছিলেন। এই কাহিনীটা বলে সজিব নানীকে বোঝানোর চেষ্টা করে ইউরেকা অত্যন্ত মহান একটি ব্যাপার। কিন্তু হিতে বিপরীত হলো। নানী বুঝতে পারলেন তার ছেলের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে। কবে হয়তো উইপোকা বলতে বলতে উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় নেমে পড়বে। যতটুকু মান সম্মান আছে সেটাও শেষ হয়ে যাবে। খুবই চিন্তিত হয়ে তিনি বললেন,

- আরো একবার কুরআন খতম দিতে হবে।

কথাটা বলার সাথে সাথেই পাগলু মামা লাফ দিয়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বললেন,

- ঠিক বলেছো মা। আজই কুরআন খতম দেওয়া যাক।

মামার কথা শুনে নানী ভীষণ অবাক হলেন। প্রতিবার কুরআন খতমের সময় পাগলু মামা ভীষণ রাগ করেন। মা-কে বারংবার কুরআন খতম দিতে নিষেধ করেন। কুরআন খতম দিলে বাড়িতে তুলকালাম কান্ড বাধিয়ে ফেলেন। নানী ভাবেন তার মাথার উপর যে দুষ্ট

জিন আছে সেই বোধ হয় কুরান খতমে এমন বাধা দিচ্ছে। তাই আজ পাগলু মামা নিজেই কুরআন খতম দিতে আগ্রহ প্রকাশ করছে দেখে নানী একই সাথে অত্যধিক অবাক হলেন এবং তারচেয়ে বেশি খুশি হলেন। তৎক্ষনাৎ বললেন,

- আজ আমার সময় নেই। কালকে আমি ঐ পাড়ার ফলেহারের ছেলে মতিয়ারকে বলবো কজন হাফেজ নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসতে ....

- না মা না। আজকেই খতম হতে হবে। দরকার হলে আমি নিজেই ফলেহারকে ডেকে আনছি। আমি তাকে চিনি ছোটবেলায় সে আমার বন্ধু ছিলো। এক সাথে আমরা লোকের গাছের আম চুরি করে খেয়েছি।

নানী ধমকে উঠলেন।

- চুপ কর হতভাগা। ফলেহার তোর জন্মের আগেই মারা গেছে। তুই তাকে কিভাবে চিনবি? আমি তো বলছি ফলেহারের ছেলে মতিয়ারের কথা।

মামা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন,

- তাহলে আমি খেলা করতাম কোন ফলেহারের সাথে?

নানী আবার থমকে ওঠেন,

- ফলেহার নয় তুমি ফলেহারের প্রেতাত্মার সাথে খেলা করেছো। হতভাগা বদমাশ।

অতএব, মামা চুপ করে গেলেন। সজিব ভাবলো এমন একটা সুযোগ মাঠে মারা গেলে হবে না। তাই সে নিজেই এবার দায়িত্বটা কাধে তুলে নিলো। বলল,

- নানী, আমি আর মামাই না হয় যায়। মামা না পারলেও আমি ঠিকই ফলেহারের ছেলে মতিয়ারকে খুঁজে নিতে পারবো।

তার কথায় কাজ হলো। সজিবের নানী নিজের ছেলের উপর আস্থা না রাখলেও নাতির উপর ঠিকই আস্থা রাখেন। বললেন,

- পূর্বপাড়ায় ফলেহারের ছেলে মতিয়ার হাফেজের নাম বললে যে কেউ পথ দেখিয়ে দেবে। তাকে বললেই সে ৫/৬ জন লোক নিয়ে চলে আসবে। দু'তিন ঘন্টার মধ্যে কুরআন খতম দিয়ে চলে যাবে। ওরা যদি আসতে চায় তাড়াতাড়ি এসে আমাকে খবর দিবি। আমার আবার তাদের জন্য খাবার তৈরী করতে হবে।

নানীর নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে সজিব পাগলু মামাকে নিয়ে বের হয়ে আসলো। সজিব ভেবেছিলো মতিয়ার হাফেজকে খুঁজে বের করা তেমন একটা কঠিন হবে না। একটা গ্রামে হাফেজ খুব একটা বেশি হয় না। অতএব মতিয়ার নাম হবে আবার হাফেজ হবে এমন ব্যক্তি একাধিক থাকার কথা না। খুব একটা কঠিন হয়তো হতোও না। কিন্তু পাগলু মামা সব কিছু গুলিয়ে দিলো। বাইরে বেরিয়ে তিনি সজিবকে কোনো কথাই বলতে দিলেন না। যাকে সামনে পান তাকেই প্রশ্ন করেন,

- ফলেহারদের বাড়ি কোনটা?

এ পদ্ধতিতে একটি সাত বছরের বাচ্ছাসহ মোট তিন জন ফলেহারকে খুঁজে পাওয়া গেলো। তাদের মধ্যে সেই ফলেহারকেও পাওয়া গেলো যার সাথে পাগলু মামা ছোট বেলায় মোরগ লড়াই খেলেছেন। মামা তখন গর্ব করে বললেন,

- সাজু দেখেছিস? তোর পাগলু মামা কোনো ভুল করে না।

সাজু সেটা দেখলো এবং অবাক হলো। পরে সে মামাকে স্মরণ করিয়ে দিলো যে, তারা আসলে ফলেহারের খোঁজে আসেনি বরং এসেছে ফলেহারের ছেলে মতিয়ারের খোঁজে। মামা তখন চট করে বললেন,

- বৈজ্ঞানিক নিয়মে কাজ করো। আগে অনুমান তারপর পর্যবেক্ষণ তারপর সিদ্ধান্ত। মতিয়ার যেহেতু ফলেহারের ছেলে অতএব যে তিনজন ফলেহারের নাম আমরা পেয়েছি তাদের মধ্যে একজনের ছেলেই তো হবে মতিয়ার তাই না? চলো আমরা ঐ তিনজনের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের ছেলেদের নাম কি তা জেনে আসি। ঠিক না?

সজিব হালকা রাগত স্বরে বলল,

- না। তা নয়।

মামা অবাক হয়ে বললেন,

- কেনো নয়?

সজিব শ্লেষ মিশ্রিত কণ্ঠে বলল,

- কারণ আমরা যে কয় জনের সাথে সাক্ষাত করেছি তারা সকলে জীবিত আর মতিয়ার হাফেজ যে ফলেহারের ছেলে সে মৃত।

মামা কথাটার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন এবং ভিষণ চিন্তিত হয়ে বললেন,

- তাহলে তো মতিয়ার হাফেজকে খুঁজে পাওয়ার কোনো উপাই আমি দেখছি না। চলো বাড়ি ফিরে যায়। মার কাছে অন্য কোনো হাফেজের নাম জেনে আসি।

সজিব ধমক দিয়ে বলে,

- তার দরকার হবে না। কেবল তুমি মুখে তালা মেরে থাকো। তাহলে আমিই তোমাকে মতিয়ার হাফেজের বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো।

মামা তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন,

- হু। যে আমি এই গ্রামে ত্রিশ বছর ধরে বসবাস করি সেই আমিই মতিয়ার হাফেজকে খুঁজে বের করতে পারলাম না আর তুই আজকের ছেলে হয়ে তাকে খুঁজে বের করতে পারবি। কোনো বিজ্ঞান মনষ্ক ব্যক্তি এটা কি বিশ্বাস করবে ভেবেছিস?

সজিব বিরক্ত হয়ে বলে,

- বক বক না করে চুপ করে থাকো। তাহলেই দেখবে আমি পারি কি পারি না।

মামা আবারো তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বললেন,

- দেখায় যাক না।

ইতোমধ্যে একজন আধাবয়স্ক লোককে দেখে সজিব প্রশ্ন করে,

- হাফেজ মতিয়ারদের বাড়ি কোনটা?

লোকটা হাত দিয়ে ইশারা করে পাশের একটা বাড়ি দেখিয়ে দিলো। সাথে সাথে সজিবের মুকটা জ্বলজ্বল করে উঠলো আর পাগলু মামার মুকটা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি তারা ঐ বাড়ির নিকটে গিয়ে বলল, হাফেজ মতিয়ার কি বাড়িতে আছেন। ভিতর থেকে একটা মহিলা কণ্ঠ বলল,

- ওনারা বাড়িতে নেই।

কথাটা সজিবের কাছে কেমন যেনো বেমানান লাগলো। উনি না বলে ওনারা বলার কারণটা কি? কৌতুহলী হয়ে সে বলল,

- কোথায় গিয়েছেন?

- একজন গিয়েছে মাঠে অন্যজন হাটে।

সজিব অবাক হয়ে বলল,

- দুজন দুই দিকে?

সজিবের কথা শুনে পাগলু মামা গম্ভীর ভাবে বললেন,

- ওরা হলো দুই ভাই। এক জনের নাম হাফেজ অন্য জনের নাম মতিয়ার। দুজন দুই দিকে গেছে এতে অবাক হওয়ার কি আছে?

- কিন্তু আমরা তো হাফেজ মতিয়ার নামে একজনকে খুঁজছি দুইজনকে নয়।

সজিব মামাকে বুঝিয়ে বলে। ব্যাপার বুঝতে পেরে মামা হিহি করে হেসে ওঠেন। আর বিড়বিড় করে বলেন,

- আহা! একটুখানি ছেলে হয়ে একজন বিজ্ঞানীর সাথে পাল্লা দেয়।

বলে আবারো হিহি করে হেসে ওঠেন। এর পর সজিব আরো কয়েকজনের কাছে প্রশ্ন করে আর তারা মাথা নেড়ে হাফেজ মতিয়ার নামে কাউকে চেনে না এমন বলার সাথে সাথে পাগলু মামা হি হি করে হেসে ওঠেন।

অবস্থাদৃষ্টে সজিব বেশ অবাক হয়। একজন হাফেজকে তো পাড়ার লোক সহজেই চেনার কথা। কিন্তু কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করেও তো কোনো ফল পাওয়া গেলো না। তখনই হঠাৎ তার মনে একটা পরিকল্পনা আসে। পাশেই দাড়িয়ে থাকা লোকটাকে প্রশ্ন করে।

- মতি হাফেজকে চেনেন?

লোকটা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে,

- ফেলুর ছেলে মতি?

সজিব সহাস্যে মাথা ঝাকায়?

- হ্যাঁ হ্যাঁ। ফেলুর ছেলে মতি।

- ঐ যে টিনের ঘরটা দেখছো ওটাই ওদের বাড়ি।

বলে লোকটি একটু দুরে অবস্থিত একটা টিনের ঘর দেখিয়ে দেয়।

- চল মামা, পেয়ে গেছি।

বলে সজিব দ্রুত পায়ে হাটতে থাকে।

মামা গজ গজ করতে করতে বলেন,

- ফেলুর ছেলে মতির বাড়ি গিয়ে কি লাভ? আমাদের তো দরকার ফলেহারের ছেলে মতিয়ারকে।

সজিব বলে,

- দুজন একই ব্যক্তি।

মামা অবাক হয়ে বললেন,

- একই ব্যক্তি কিভাবে?

সাজু হেয়ালী করে বলল,

- তাকে দেখলেই বুঝবেন।

টিনের বাড়িটিরে নিকটে গিয়ে সজিব ডাকলো,

- হাফেজ মতিয়ার কি বাড়িতে আছেন?

ভিতর থেকে শব্দ হলো,

- কে?

পাগলু মামা বলল,

- আমি

- আমি কে?

সজিব বিরক্ত হয়ে বলল,

- একটু বাইরে আসুন।

একটু পরেই ঘর্মাক্ত দেহে কাধে গামছা দিয়ে একটি লোক বের হলো যার মুক ভর্তি দাড়ি। সজিব জিজ্ঞাসা করলো,

- আপনিই কি হাফেজ মতিয়ার?

লোকটি বলল,

- জী হ্যাঁ।

পাগলু মামার বিশ্ময়ের সীমা রইলো না। যার নাম মতিয়ার তাকে মতিয়ার নামে খুঁজে সারা গ্রামে পাওয়া গেলো না, এমনকি তার বাবার নামে খুঁজেও পাওয়া গেলো না অথচ

ফেলু আর মতি নামে খোঁজ করে একবারে খুঁজে বের করা গেলো। রহস্যটা তিনি কিছুতেই ধরতে পারছেন না। লোকটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে তাই তিনি বললেন,

- আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি হাফেজ মতিয়ার?

প্রশ্ন শুনে লোকটি খুব বিব্রত বোধ করলেন বলে মনে হয়। মুখে বিরক্তি প্রকাশ পেলেও কথায় ভদ্রতা প্রকাশ করে বললেন,

- আমিই মতিয়ার আর আমি নিশ্চিত হবো না?

পাগলু মামা মাথা ঝাকিয়ে বলতে থাকলেন,

- তা তো ঠিক। তবে মতি হাফেজ কে?

লোকটি বিশ্ময় প্রকাশ করে বলে,

- সেও আমি।

পাগলু মামা এমন ভাব করেন যেনো কোনো অষ্টমাশ্চর্য খুঁজে পেয়েছেন। তারপর বিড়বিড় করে বলেন,

- দুই দেহ এক প্রাণ?

সজিব তার কথা সংশোধন করে বলল,

- এক দেহ দুই নাম।

এসব কথার মাথামুন্ডু কিছুই লোকটি বুঝতে পারে না। তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে রয়েছে। দুজন পাগল লোক এসে যা গন্ডগোল পাকিয়ে যাচ্ছে তাতে তার সব কাজের বারোটা বেজে যাবে বলেই মনে হচ্ছে। এসব ভেবে তিনি ভিতরে ভিতরে দারুণ রাগ অনুভব করেন। সজিব ব্যাপার বুঝতে পারে। তাড়াতাড়ি তাকে ঠান্ডা করার জন্য বলে,

- একটা খতম পড়াতে হবে?

খতম পড়ানোর কথা শুনে হাফেজ সাহেবের মনের সব রাগ খতম হয়ে যায়। খুশিতে গদগদ হয়ে বলেন,

- কাদের বাড়িতে?

- মিঞা বাড়িতে।

মিঞা বাড়ির কথা শুনে হাফেজ সাহেবের অনেক কিছু মনে পড়ে যায়। তিনি তখন পাগলু মামাকেও চিনতে পারেন। এই লোকটির উপর নাকি দুষ্টু জিনের আছর আছে। তাই মাঝে মাঝেই জিন তাড়ানোর জন্য মিঞা বাড়ি কুরআন খতম দেওয়া হয়। কিন্তু আজ সেই লোক নিজেই কুরআন খতম দেওয়ার জন্য হাফেজ ডাকতে এসেছে দেখে মতি হাফেজের তাই বিশ্ময়ের সীমা রইল না। তবে মুখে কোনো বিশ্ময়ের ভাব প্রকাশ না করেই তিনি বললেন,

- কবে?

পাগলু মামা সাথে সাথে বলে উঠলো,

- এই মুহুর্তে।

কথাটা শুনে লোকটার মুখ শুকিয়ে যায়। তিনি আমতা আমতা করে বলেন,

- কিন্তু এখন কদিন তো আমার খুব কাজ। ধান মাড়তে হবে, ভুট্টা ঝাড়তে হবে তুলা ঠেঙাতে হবে ...

তিনি হয়তো আরো কিছু বলতেন কিন্তু পাগলু মামা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

- এতো কাজ আপনি একাই করেন?

প্রতুত্তোরে লোকটি কিছুটা বিব্রত হয়ে বলল,

- একা করবো কেনো? জন-মুনিষে করে।

পাগলু মামার এই এক বিচিত্র অভ্যাস হলো এক কাজে এসে অন্য কাজে নাক গলিয়ে সময় নষ্ট করেন। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়েই তার যেনো কৌতুহল বেশি থাকে। সেই ধারাবাহিকতা বজাই রেখে তিনি আবারো বলেন,

- একেক জন জন-মুনিষে কত টাকা করে নেয়।

কুরআন খতমের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছে দেখে লোকটা খানিকটা বিরক্ত হয় কিন্তু সেটা গোপন করার চেষ্টা করে বলে,

- দেড় দুশো টাকা করে নেয়।

- এতো কম? তা আপনারা খতম পড়াতে কত টাকা নেন?

খতম প্রসঙ্গে কথা হতে দেখে মতি হাফেজ আবারো খুশি হয়ে যান। লাল দাঁতগুলো বের করে বলেন,

- এক বেলা খাওয়া আর এক দুই হাজার টাকা।

খাওয়ার কথা শুনে মামা অবাক হয় না। জন-মুনিষেও মানুষের বাড়িতে এক বেলা খায়। কিন্তু দুই হাজার টাকার কথা শুনে মামা ভীষণ অবাক হয়। চোখ কপালে তুলে বলেন,

- এতো গুলো টাকা! যেখানে জন-মুনিষে দেড় দুশো টাকা নেয় সেখানে আপনি দুই হাজার টাকা নেবেন?

পাগলু মামার কথায় মতি হাফেজ খুব বেশি রাগান্বিত হলেন না। হয়তো ভাবছেন পাগল মানুষে কিছু একটা মন্দ কথা বললে বলুক তাতে কোনো যায় আসে না। অথবা পাছে খতমটা মিছ যায় তাই তার কথা গায়ে মাখলেন না। উল্টো পাগলু মামাকে বিষয়টা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর চেষ্টা করলেন।

- দেখুন আমি তো আর একা খতম পড়তে যাবো না। ৬/৭ জন লোক যাবে, এক সাথে খতম পড়বে। তাতে জন প্রতি দুই তিনশো টাকাই পড়ে।

মামা এবার হিসাটা মিলাতে পারেন। সহাস্যে বলেন,

- ও হো। তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু ...

মামার মুখে কিন্তু শুনে লোকটার মুখটা আবারো ফ্যাকাসে হয়ে গেলো?

- কিন্তু কি?

- কিন্তু এবার তো এক সাথে এতো লোক খতম দিলে হবে না। একজন একাধারে খতম দিতে হবে।

লোকটি অবাক হয়ে বলে,

- কেনো?

পাগলু মামার উদ্দেশ্য সজিব বুঝতে পারে। মামার চশমাটি পরে সম্পূর্ণ কুরআন খতম না দিলে চশমার মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআন প্রবেশ করানো যাবে না। তাই এক সাথে অনেক লোক কুরআন পড়লে সে উদ্দেশ্যে সফল হবে না। বরং একজন ব্যক্তিকে চশমা চোখে সারাদিন কুরআন পড়তে হবে। কিন্তু এভাবে বললে লোকটি বুঝবে না তাই সজিব তাকে অন্যভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে।

- দেখুন, এক সাথে কয়েকজন কুরআন পড়লে কেউ কেউ হয়তো ফাঁকি দেয় বা কারো পড়া হয়তো সহীহ হয় না তাই খতমে কোনো কাজ হয় না। তাই এবার ভাবছি একটা

ভালো হাফেজ দিয়ে সম্পূর্ণ খতম দেবো। খোঁজ নিয়ে জানলাম আপনিই ভালো হাফেজ। পুরো টাকাটা না হয় আপনি একাই ....

আর বলতে হয় না, সজিবের কথায় মন্ত্রের মতো কাজ হয়। একদিকে ভালো হাফেজ উপাধী অন্য দিকে পুরো দুই হাজার টাকার লোভে মতি হাফেজের চোখ চকচক করতে থাকে। সে অনুনয় করে বলে,

- সে না হয় হবে কিন্তু আমাকে দুদিন সময় দিতে হবে।

সজিব বিনয়ের সাথে বলে,

- আজ হলে ভালো হতো।

লোকটি আবারো অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে,

- না, আজ সম্ভব নয়।

পাগলু মামা যেনো ধৈর্য্য ধরতে পারেন না। হঠাৎ বলে ওঠেন,

- আজ খতম দিলে আপনাকে ডাবোল পারিশ্রমিক দেবো।

ডাবল পারিশ্রমিকের কথা শুনে লোকটা একটু নড়ে চড়ে বসে। আমতা আমতা করে বলে,

- দাড়ান, ভিতর থেকে ঘুরে এসে জানাচ্ছি।

সজিবরা কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থাকলো। এর মাঝে মতি হাফেজ ভিতর থেকে ঘুরে আসলেন। কেবল ঘুরে আসলেন বললে ভুল হয় পুরা তৈরী হয়ে আসলেন। লম্বা জামা আর টুপি পরিধান করে হাতে একটা কুরআন শরীফ নিয়ে বের হয়ে এসে তিনি বললেন,

- তবে চলুন।

বাড়িতে এসেই দেখা গেলো নানী আগে থেকে বিছানা পেতে রেখেছে। মতি হাফেজ সেখানে বসেই দ্রুত কুরআন পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মামা তাকে থামিয়ে বললেন,

- দাড়ান, চশমাটা নিয়ে আসি।

কথাটা বলেই মামা তার তথাকথিত ল্যাবরেটরীর দিকে চলে যান আর মতি হাফেজ অবাক হয়ে তার গতি পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মামা তার বিশাল আকৃতির চশমাটা নিয়ে হাজির হলেন। চশমা দেখে তো হাফেজ সাহেবের চোখ ছানাবড়া

হওয়ার মতো অবস্থা। তিনি মনে মনে বললেন, ‘‘এ কি রাক্ষুসে চশমা’’ কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। কেবল মামা কি করেন নিরবে তাই দেখতে থাকেন।

- নিন চশমাটা পরে নিন।

বলে পাগলু মামা নিজে হাতেই হাফেজ সাহেবের চোখে বিশাল চশমাটা পরিয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু চশমাটা কিছুতেই চোখে দাড়ায় না। হাত ছেড়ে দিলেই মাটিতে পড়ে যেতে চায়। শেষে পাগলু মামা একটা বুদ্ধি বের করে ফেললেন। একটা দড়ি দিয়ে চশমাটা হাফেজ সাহেবের চোখে ভালো করে আটকিয়ে দিলেন।

মতি হাফেজ অবাক হয়ে বলেন,

- কিসের চশমা এটা?

- ঐ দুষ্টু জিনটা এটা আমাকে দিয়ে গেছে। বলেছে, আমাকে তো কুরআন শুনিয়ে তাড়াতে পারলি নে এবার আমার চশমাকে যত পারিস কুরআন শোনা।

কথাটা শুনে মতি হাফেজ একেবারে চুপসে গেলেন। চশমার যা আকৃতি তাতে তা জিন পরীদের চশমা বলেই মনে হচ্ছে। আর পাগলু মামার মুখের কথা শুনে তিনি সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন। অতএব, কোনো উচ্চবাচ্চ না করে তিনি চশমা চোখে কুরআন পড়তে লাগলেন। ঐ বিশাল চমশা চোখে হাফেজ সাহেবকে দেখে সজিব আড়াল থেকে হেসে গড়িয়ে যাচ্ছিলো। তাকে যে কি উদ্ভট লাগছিলো তা বলার নয়। হাফেজ সাহেব যদি নিজেই নিজেকে দেখতে পারতেন তবে তিনি নিজেও হাসতেন।

সজিব ভেবেছিল কুরআন খতম দিতে সারাদিন লেগে যাবে। কিন্তু দেখা গেলো, ৪/৫ ঘন্টার মধ্যে কুরআন খতম দেওয়া শেষ হয়ে গেলো। সজিব ভাবে,

- একজন হাফেজ ত্রিশপারা কুরআন ৪/৫ ঘন্টার মধ্যে শেষ করে দিলো। এটা কিভাবে সম্ভব? হাফেজরা কি জাদু জানে?

খতম শেষে চশমাটা মামার হাতে ধরিয়ে দিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে হাফেজ সাহেব বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকলেন। নানী এসে তার হাতে কি যেনো গুজে দিলো। হাতের দিকে তাকিয়ে কত টাকা আন্দাজ করে হাফেজ সাহেব মনমরা হয়ে বসেই থাকলেন। কিছুক্ষণ পর নানী বলল,

- কি হয়েছে বাবা?

- ইয়ে মানে টাকা।

- আমি তো প্রতিবারই দেড় হাজার টাকা দিই।

- না মানে আপনার ছেলে বলেছিলো এবার ডাবল দেবে।

নানী এবার পাগলু মামার দিকে তাকিয়ে ধমকে ওঠেন,

- এই হাবু তুই কি ডাবল দেওয়ার কথা বলেছিস?

পাগলু মামা তড়িঘড়ি করে বললেন,

- হ্যাঁ মা। একটা জনের দাম দুইশ টাকা আমি ভেবেছিলাম উনাকে তার ডাবল দেবো।

নানী এবার হাফেজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন,

- দেখলে তো? সে হিসেবে তুমি বেশিই পেয়েছো। একটা পাগল ছেলে কি বলল তুমি সেটা ধরে আছো? তুমিও কি পাগল নাকি?

অতএব হাফেজ সাহেবের আর কিছুই বলার থাকলো না। তিনি দ্রুত বিদাই নিলেন। সম্ভবত তিনি বাড়ি গিয়ে ধান মাড়াবেন বা তুলা ঠেঙাবেন। পাগলু মামা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চশমাটাকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললেন,

- সর্বনাশ হয়ে গেছে।

মামা লাফিয়ে উঠা দেখে চমকে উঠে সজিব বলল,

- কি হয়েছে মামা?

- ঐ বেটা ফাঁকি মেরেছে। পাঁচ ভাগের এক ভাগ কুরআনও সে পড়েনি।

সজিব অবাক হয়ে বলে,

- কিভাবে বুঝলে?

পাগলু মামা তখন তাকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দেন।

- মোবাইলে যেমন ব্যাটারির চার্জ কত কয়েকটা দাগের মাধ্যমে তা বোঝা যায়। আমার চশমাতেও কুরআনের কতটুকু লোড হয়েছে তা বোঝা যায়। এই যে দাগের দিকে খেয়াল কর। এখানে সবগুরো দাগ হলুদ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু যতটুকু হলুদ হয়েছে তা পাঁচ ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম।

পাগলু মামার কোনো কথাই সজিব বুঝতে পারে না তবে এই কথাটি বুঝতে পারলো। মামার কথা ঠিক হয়ে থাকলে হাফেজ বেটা নিশ্চয় ফাঁকিবাজি করেছে। কিন্তু হাফেজ

হয়ে কুরআন নিয়ে ফাকিবাজি করবে এটা সজিবের কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না। পাশেই তার নানী দাড়িয়ে ছিলো। তিনি সব কথা শুনেছেন এবং ঘটনা বুঝতে পেরেছেন। হঠাৎ চেচিয়ে বলেন,

- তাই তো বলি বছরে দুবার খতম দিয়েও দুষ্টু জিন কেনো বিদাই হচ্ছে না। আল্লাহর কালামে তো আর দোষ নেই। এসব ফাঁকিবাজ হাফেজদের মনেই যত দোষ। এযাবৎ যত খতম দিয়েছি সব টাকা আমি আজ মতির কাছ থেকে আদায় করেই ছাড়বো।

কথাটা বলেই সজিবের নানী মতি হাফেজের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। সেখানে গিয়ে তিনি নিশ্চয় তুলকালাম কান্ড বাধাবেন। পাগলু মামা আর সজিবও তার পিছে যাত্রা করলো। মতি হাফেজের আজ একটা শিক্ষা দিতেই হবে। মিঞা বাড়ি থেকে ফাঁকি দিয়ে দেড় হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার বিষয়টাতো কম কথা নয়।

মতি হাফেজের বাড়ি গিয়েই নানী শুরু করলেন,

- এই মতি, কুরান খতমে ফাঁকি দিস? এতো বড় সাহস তোর।

চেঁচামেচি শুনে দুপাঁচ জন লোক জড় হয়ে যায়। ঘটনা শুনে তারাও ভীষণ নিন্দা-মন্দ শুরু করে। কুরান খতমে ফাঁকি দেওয়ার কথা শুনে মানুষ ভীষণ রেগে ওঠে। মতি বেচারা পুরা ভেবাচেকা খেয়ে যায়। আমতা আমতা করে বলেন,

- পরে আরেকবার পড়ে দেবো?

পাগলু মামা ভীষণ রেগে আছেন। কথাটা শুনে তিনি রেগে উঠে বলেন,

- পরে নয় আজই পড়ে দিতে হবে। আমার আজই দরকার।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গও এতে সম্মতি জানায়

- আজকের কাজ কালকে হবে কেনো? যাও আজই খতম পড়ে দিয়ে এসো।

অগত্যা কি আর করা মতি হাফেজ আবারো খতম পড়াতে মামাদের বাড়িতে আসলো আর পাগলু মামা আগের মতোই চশমাটা তার চোখে বেধে দিলো। আর একটা লাঠি হাতে তার চারিপাশে পায়চারি করতে লাগলো। মনে হচ্ছে কুরআন পড়তে সামান্য ভুল হলে মতি হাফেজের মাথাটাই এবার তিনি ফাটিয়ে দেবেন। সব কিছু দেখে শুনে হাসতে হাসতে সজিবের তো পেট ফেটে যাওয়ার অবস্থা হলো। এবার খতম দিতে প্রায় রাত ১৭/১৮ ঘন্টা লেগে গেলো। গভীর রাতে মতি হাফেজ পাগলু মামার হাত থেকে ছাড়া পেলো। আর ছাড়া পেয়েই জান বাঁচাতে দ্রুত পালিয়ে গেলো। সজিব তখন ঘুমিয়ে ছিলো।

সকালে উঠে সে দেখলো মামা ল্যাবরেটরীতে বসে আছেন। তাকে দেখেই দ্রুত বলে ওঠেন,

- এই তোর ঘুম ভাঙলো? আমি কখন থেকে বসে আছি চশমাটা পরীক্ষা করার জন্য।

হাই তুলতে তুলতে সজিব বললো,

- তুমিই পরীক্ষা করো না।

মামা কৌতুকের স্বরে বলেন,

- নিজের জিনিস নিজেই পরীক্ষা করতে নেই। নিজের রান্না তো সবাই ভালো বলে।

মামার কথার আগা মাথা কিছু না বুঝলেও সজিব চশমাটা পরীক্ষা করে দেখতে রাজী হয়। মামার হাত থেকে চশমাটা নিয়ে চোখে দেয়। তারপর মামার দিকে ফিরে তাকায়। পাগলু মামাও সোজাসুজি চশমাটার দিকে তাকান। আর সাথে সাথেই সজিব ভয়ে আতকে উঠে দু হাত পিছনে সরে যায়। আর চশমাটা তার চোখ থেকে মাটিতে পড়ে যায়। চশমার ফ্রেমটা নিশ্চয় ভীষণ শক্ত তাই কোনো ক্ষতি হয় না। পাগলু মামা অবাক হয়ে বলেন,

- কী হলো?

কিছুক্ষণ নিরব থেকে সজিব বলে,

- কিছু না।

পাগলু মামা নাছোড়বান্দা।

- কিছু তো বটেই। আর যেহেতু বলতে চাচ্ছিস না তার মানে মারাত্মক কিছু।

সজিব বুঝতে পারে সে যত বেশি কচলাকচলি করবে মামা তত বেশি বিচলিত হয়ে পড়বে। কিন্তু সে যা দেখেছে তা তো অবিশ্বাস্য। নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে সে বলে,

- দাড়াও আরেক বার দেখি।

বলে মাটি থেকে চশমাটি তুলে নিয়ে চোখে দিতেই সজিব আবারো আতকে ওঠে। তারপর চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে পাগলু মামার দিকে তাকিয়ে বলে,

- কোথাও কোনো ভুল হয়েছে, মামা।

মামা বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন,

- ভুল হয়েছে? কেনো?

সজিব এবার বিষয়টি খোলোসা করে বলে,

- চশমায় তোমাকে একটা বলদ রুপে দেখা যাচ্ছে।

সজিবের কথা মামা হজম করতে পারলেন না।

- বলদ মানে গরু। একজন মহাবিজ্ঞানীকে এই চশমায় গরুর আকৃতিতে দেখাচ্ছে? এতো মারাত্মক অন্যায়। এটা ঐ মতি বেটারই কাজ। ঐ মতি হাফেজকে আমি ছাড়বো না।

কথাটা বলেই মামা হুংকার ছেড়ে বের হয়ে যাচ্ছিলেন মতি হাফজকে খোঁজার জন্য কিন্তু সজিব তাকে থামিয়ে বলে।

- চশমাটা তো মতি হাফেজ তৈরী করেনি মামা। তৈরী করেছো তুমি। অতএব চশমার মধ্যে কোনো ভুল থেকে থাকলে সেটা তোমারই ভুল।

মামা রাগত স্বরে বলেন,

- ভুল করবো আমি? আমি কখনও ভুল করি? ঐ মতি হাফেজ মনে হয় আবারো কুরআন পড়তে গিয়ে ফাঁকিবাজি করেছে।

চশমার যে স্থানে ব্যাটারীর চার্জের মতো দাগ দেখা যায় সেদিকে ইঙ্গিত করে সজিব বলে,

- কিন্তু তোমার চশমা তো বলছে কুরআন পড়তে মতি হাফেজ কোনো ফাঁকিবাজী করেনি। সব কিছু ঠিক ঠাকই আছে।

মামা এবার নিরব হয়ে যান। বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে কিছুক্ষণ ভাবেন। বিড়বিড় করে বলেন,

- তবে কি আমি সত্যিই একটা গরু? আইনস্টাইন, নিউটন সবাই গরু? দুনিয়ার তাবৎ বিজ্ঞানী গরু?

সজিব লক্ষ্য করে তার পাগলু মামা নিজেকে আইনস্টাইন বা নিউটনের সাথে তুলনা করছেন। দুদিন আগে হলেও সজিব এটা মেনে নিতো না কিন্তু এখন এই আজব চশমাটা তৈরী করে মামা বিজ্ঞানী হিসেবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। অতএব এখন তিনি দুনিয়ার আর যে কোনো বিজ্ঞানীর সাথে নিজেকে সমান মনে করতে পারেন। সে হিসেবে তিনি যদি গরু হোন তবে অন্য বিজ্ঞানীরাও তার চেয়ে ভিন্ন কিছু নন সেটা অনায়াশেই বলা যায়। তখনই সজিব শোনে তার পাগলু মামা বলছে,

- তাই বলে গরু! শিয়াল হলেও না হয় হতো।

সজিব অবাক হয়ে বলে,

- শেয়াল হলে কি হতো মামা?

মামা গম্ভীরভাবে বলে,

- শুনিসনি? লোকে বলে শেয়াল পন্ডিত। একজন বিজ্ঞানীকে শেয়াল পন্ডিত রুপে দেখা গেলেও সেটা না হয় মেনে নেওয়া যেতো। কিন্তু গরু হলো বোকমীর প্রতিক আর বোকার উপাধী। বোকা মানুষকে লোকে বলদ বা গরু বলে গালি দেয়। একজন জ্ঞানী-গুনি পন্ডিত ব্যক্তি না হলে কি আর আমি এমন একটা চশমা তৈরী করতে পারতাম? আর আজ আমারই তৈরী চশমায় আমাকে গরুর আকৃতিতে দেখাচ্ছে। এ দুঃখ আমি রাখবো কোথায়।

সজিব পাগলু মামাকে সমবেদনা জানিয়ে বলে,

- একেই বলে যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর।

মামা এবার সত্যি সত্যি রেগে গেলেন,

- চুরি? কিসের চুরি? আমি কি চুরি করেছি? কবে চুরি করেছি? চুরি তো করেছে ঐ মতি হাফেজ। সে কুরআন চুরি করেছে কুরআনে ফাঁকি দিয়েছে।

সজিব বুঝতে পারে পাগলু মামা যে কোনো মূল্যে সব দোষ মতি হাফেজের উপর ফেলতে চাচ্ছেন। বেচারা সেদিন কুরআনে ফাঁকি দিয়েছিলো ঠিকই কিন্তু তাই বলে সব দায়ভার তার উপর চাপানো যায় না। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্য সজিব তাই বলে,

- কিন্তু তোমার চশমা কিন্তু ঠিকই আছে মামা। চশমায় কোনো ভুল ত্রুটি নেই।

চশমায় ভুলত্রুটি নেই কথাটা শুনে মামা একটু খুশি হলো কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়ে গেলো যদি চশমায় ভুলত্রুটি না থাকে তার মানে তিনি প্রকৃতই একজন বলদ ওরোফে গরু। অতএব তার মনটা আবারো খারাপ হয়ে গেলো। তার মানে বিজ্ঞানী হয়েও তিনি বলদ আর ঐ মতি হাফেজই মহা জ্ঞানী! বিষয়টা তিনি মেনে নিতে পারেন না। রেগে-মেগে তিনি বলে ওঠেন,

- আমি যদি গরু হয় তবে ঐ মতি হাফেজ একটা আস্ত গাধা।

সজিব বুঝতে পারে মামা আবারো মতি হাফেজকে টেনে এনে একটা গন্ডগোল সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন। সে হাফেজ সাহেবের পক্ষ নিয়ে বলে,

- মতি হাফেজ কেনো গাধা হতে যাবে?

মামা হুংকার ছেড়ে বলেন,

- হবে, হবে। আলবাত হবে। তাকে গাধা হতেই হবে। বিশ্বাস না হয় তুই চশমাটা নিয়ে মতির বাড়ি যা। নিজে চোখে মতি হাফেজকে দেখে আয়।

বিষয়টা দেখার জন্য সজিবের অন্তরেও যথেষ্ট কৌতুহল ছিলো। মামার কথা শুনে তাই সে রওয়ানা হয়। সোজা চলে যায় মতি হাফেজের বাড়ি। তাকে দেখেই হাফেজ সাহেব প্রথমে আতকে ওঠেন। আবার বুঝি কোনো ভুল হলো। কিন্তু সজিব তাকে আকৃষ্ট করার জন্য বলে,

- ভয় পাবেন না। আমি আপনার একটা ছবি তুলবো।

ছবির কথা শুনে হিতে বিপরীত হলো। মতি হুজুর প্রথমে চমকে উঠলেন তারপর ধমকে উঠে বললেন,

- ছবি তোলা হারাম। আমার উস্তাদ জী বলতেন ছবি তোলা আর শুয়োরের মাংস খাওয়া একই রকম অপরাধ।

সজিব বুঝতে পারে ছবি তোলার কথায় মতি হুজুর রাগান্বিত হয়েছেন। তাকে শান্ত করার জন্য সে বলে,

- এটা কি কুরআন খতমে ফাঁকি দেওয়ার চেয়েও মারাত্মক অন্যায়?

আবারো হিতে বিপরীত হলো। মতি হুজুর এবার রাগের চোটে পাগলা ঘোড়ার মতো লাফাতে শুরু করলেন। সজিব বুঝতে পারে পরিস্থিতি খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে। এখনই লাগাম টেনে না ধরলে মতি হুজুর এখনই তাকে মারধর করে বিদাই করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হঠাৎ তার মনে একটা দুষ্টু বুদ্ধি জেগে উঠলো। হতাশ হয়ে বলল,

- ভেবেছিলাম পত্রিকায় আপনার নামে একটা বিজ্ঞাপন দেবো। তাতে আপনারই ভাল হতো। কিন্তু সেটা আর করা হলো না।

পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের কথা শুনে মতি হুজুর বিশ্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। নিজের অজান্তেই বলে উঠলেন,

- বিজ্ঞাপন! কোন পত্রিকায়? কিসের বিজ্ঞাপন?

শিকার টোপ গিলেছে দেখে সজিব এবার পুরো বিষয়টি তাকে বুঝিয়ে বলে।

- আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ‘‘আজকাল টালমাটাল’’ নামক পত্রিকায় আপনার নামে একটা হিট বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবো। তাতে বিশ্ব জুড়ে আপনার সুনাম দক্ষিণা বাতাসের মতো হু হু করে বইতে থাকবে। তার শিরোনামে লেখা থাকবে। ‘নির্ভেজাল কুরআন খতম’। নিচে লেখা থাকবে, ভাই সব, আজকের দিনে তেল লবনে ভেজাল, কুরানের খতমেও ভেজাল। অনেক হাফেজ খতম পড়তে এসে সম্পূর্ণ কুরান পড়ে না। এই দুরাবস্থা দেখে সারা দেশের খতমের দায়িত্ব নির্ভেজালভাবে সম্পাদন করতে এলো মতিয়ার খতমে কুরআন সোসাইটি। অল্প খরচ এবং কম খাবারে আমরা একটি খতমে কুরানের অনুষ্ঠান সম্পাদন করে থাকি। সব শেষে যোগাযোগের জন্য আপনার মোবাইল নাম্বার দিয়ে দেবো।

সজীবের কথা শুনে মতি হুজুর ভীষণ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পুরো ব্যাপরটা তিনি কল্পণা করার চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝেই পত্রিকার বিজ্ঞাপনগুলো তার চোখে পড়ে। একজন মানুষের ছবির পাশে তার নাম ও প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে সজিব যেমন বলল তেমন মজার মজার কথা লেখা থাকে। তার নামে এমন একটা বিজ্ঞাপন বের হলে তিনি সত্যিই ধন্য হবেন। দেশ-বিদেশ থেকে তখন মানুষ তাকে খতম পড়ার জন্য ডাকবে। তিনি তখন দেড় দুই হাজারের বদলে চার পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিক নেবেন। কোটি কোটি টাকার ইনকাম করবেন। বর্তমান স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বড় লোকের মেয়ে বিয়ে করবেন ইত্যাদি। কিন্তু হঠাৎ তার সব স্বপ্ন ভেঙে গেলো। মুখটা পাংশু করে বললেন,

- আমার তো কোনো মোবাইল নেই।

সজিব তড়িঘড়ি করে বলল তাতে কি হয়েছে। সারা দেশের লোক যখন আপনার সাথে যোগাযোগ করে খতম পড়াতে শুরু করবে তখন আপনি কোটি কোটি টাকা কামায় করতে পারবেন। তখন দু-বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা বড় মোবাইল কিনে নেবেন।

এই প্রস্তাব মতি হুজুরের বেশ পছন্দ হলো। কোটি কোটি টাকা ইনকাম করলে দু-বিশ হাজার টাকা দিয়ে মোবাইল ফোন কিনতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এখন মোবাইল না থাকলে সারা দেশের লোক তার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে সে ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তার মনে উদয় হলো না। ভীষণ আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন।

- তবে দাড়ান। আমি রেডি হয়ে এখুনি আসছি।

এখুনি আসি বললেন বটে কিন্তু আসতে তার বেশ দেরি হলো। চুল দাড়ি আচড়িয়ে নতুন একটা পাঞ্জাবী গায়ে চাপিয়ে প্রায় নতুন বউয়ের মতো সাজ সজ্জা করে মতিয়ার হাফেজ

একটি চেয়ারে গট হয়ে বসলেন। সজিব তখন কুরানিক চশমাটা বের করে চোখে পরে নিলো। চশমাটা দেখেই মতিয়ার হুজুর আবারো আতকে উঠলেন। ভীত হয়ে বললেন,

- এটা তো সেই জিনের চশমা?

সজিব তাকে আশ্বস্ত করে বলল,

- আরে না, না। মামা পাগলামী করে ঐ কথা বলেছে। আসলে এটা একটা ক্যামেরা। আমি শহর থেকে নিয়ে এসেছি।

এই কথায় মতি হুজুর পুরোপুরি আশ্বস্ত না হলেও কিছুটা শান্ত হলেন। মাথা নিচ করে চেয়ারে স্থিরভাবে বসে থাকলেন। সজিব লক্ষ্য করলো, চশমার ভিতর দিয়ে মতি হুজুরকে এখনও মানুষের মতোই দেখাচ্ছে। মতি হুজুর চশমার দিকে দৃষ্টি না দিলে কিছুই বোঝা যাবে না। সে বলল,

- এভাবে মুখ গোমড়া করে থাকলে হবে না। বিশ্বের মানুষ ভাববে আপনি রাগী লোক। কেউই তখন আপনার কাছে কুরআন খতম দিতে আসবে না। মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসুন তো।

হুজুর এবার সজিবের চশমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে উঠলো। সাথে সাথে সজিবের চোখে হুজুরের প্রকৃত রুপ ধরা পড়লো। বিশ্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো সে। সে স্পষ্ট দেখলো একটা গাধা চেয়ারে বসে মুচকি হাসছে। গাধার মুখে হাসি দেখলে বিষয়টা কতখানি উদ্ভট লাগে তা নিজ চোখে না দেখলে বোঝানো সম্ভব নয়। সে বিড়বিড় করে বলল,

- পাগলু মামা তাহলে ঠিক কথাই বলেছে।

কথাটা আস্তে বললেও মতি হুজুরের কান পর্যন্ত পৌঁছালো। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন,

- ঐ পাগলটা আবার কি বলল?

- বলল, আপনি একটা গাধা।

কথাটা বলেই সজিব ভোঁ দৌঁড়। সে স্পষ্ট শুনতে পেলো পেছন থেকে মতি হুজুর চেচিয়ে বলছে,

- এই দাড়াও আমার ছবি আমাকে তো দেখতে দাও। সজিব মনে মনে ভাবে,

- বেটা সত্যিই একটা গাধা। এখনও ভাবছে সে সত্যি সত্যিই তার ছবি তুলেছে।

বাড়ি ফিরে পাগলু মামাকে কথাটা বলতেই তিনি ভীষণ খুশি হলেন। চশমাটা হাতে নিয়ে একটা চুমু খেয়ে বললেন,

- আমার চশমা তাহলে ঠিকই আছে।

পরক্ষণে আবার মনমরা হয়ে বললেন,

- তাই বলে একটা গরু?

সজিব বুঝতে পারে মামা কিছুতেই নিজেকে গরু হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না। সে নিজেও বিষয়টা নিয়ে ভাবে। মনে মনে বলে,

- ঠিকই তো। মামাই বা কেনো গরু হবেন আর মতি হাফেজই বা কেনো গাধা হবে।

এরপর তার মনে হঠাৎ একটা ভাবনার উদয় হয়,

- আচ্ছা আমাকে কেমন দেখাবে চশমায়?

পাগলু মামাকে বলতেই মামা ভীষণ আগ্রহ নিয়ে চশমাকে চোখে লাগালেন। তারপর হি হি করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

- কি হলো মামা, কি দেখলে?

কয়েকবার প্রশ্ন করেও সজিব কোনো উত্তর পেলো না। পাগলু মামার হাসি যেনো আর থামে না। শেষে না পেরে সজিব মামার মুখ শক্ত করে চেপে ধরে। হাসতে না পেরে তার মামার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। হাত দিয়ে তিনি মুখ ছাড়ানোর চেষ্টা করলেন।

মামার মুখ আরও শক্ত করে ধরে সজিব বলে,

- না। আগে তোমার বলতে হবে কি হয়েছে।

পাগলু মামা জোর করে নিজের মুখটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলেন,

- মুখ না ছাড়লে বলবো কিভাবে?

কথাটা বলে আবারো হি হি করতে হাসতে লাগলেন।

সজিব মুখ গোমড়া করে বলল,

- ভালো হচ্ছে না কিন্তু।

হাসতে হাসতেই মামা বলে,

- না, না। ভালোই হয়েছে। মামা-ভাগ্নে দুজনে হয়েছি গরু আর ছাগল। কি দারুণ একটা জুটি কি বলিস?

কথাটা শুনেই সজিবের মনটা ভীষণ খাবার হয়ে যায়। তার মানে তার মামা একটা গরু আর সে একটা ছাগল। মনে মনে ভীষণ রাগ হয় তার। কেনো এমন হচ্ছে বিষয়টা তাকে অবশ্যই জানতে হবে।

এ ঘটনার পর থেকে পাগলু মামার দুঃখ দুঃখ ভাবটা কেটে যায়। যে তিন জনের উপর চশমাটার প্রয়োগ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে তিনিই সেরা। গাধা ও গরুর মধ্যে যে গাধা সেরা সে বিষয়ে তার সাথে সজিব একমত হয়েছে। কিন্তু ছাগল আর গরুর মধ্যে কে সেরা সেটা নিয়ে খানিকক্ষণ বিতর্ক হয়েছে। সজিবের ধারণা ছাগলই সেরা। যেহেতু ছাগলের মাংসের দাম গরুর মাংসের চেয়ে বেশি। কিন্তু মামা বলেছে,

- মারা যাওয়ার পরে হিসাব করলে হবে না দেখতে হবে জীবিত অবস্থায় কার দাম বেশি।

কিন্তু সজিব তার কথা মেনে নিতে নারাজ। তার দাবী শেষ ভালো যার সব ভালো তার। অতএব বিতর্ক অমিমাংশিত রয়ে গেছে। সজিব তাই নিশ্চিন্ত হতে পারে না। স্কুল কলেজে শত শত বই পুস্তক পড়াশুনা করে কুরানিক চশমায় শেষে সে কি না একটা ছাগলে পরিণত হলো। মা শুনলে এমনভাবে কান মলে দেবে যে কানগুলো ছাগলের মতোই লম্বা হয়ে যাবে। মনে মনে সে ভাবে,

- এর একটা বিহিত করতেই হবে।

কেবল মনে মনে নয় বাস্তবেই একটা বিহিত করার জন্য সজিব উঠে পড়ে লেগে গেলো। সে নানী বাড়ির প্রশস্ত উঠানটির এদিক থেকে সেদিক ঘুরা ফিরা করতে থাকলো আর মুখে বিড়বিড় করে বলতে লাগলো,

- গরু, ছাগল, গাধা। গরু, ছাগল, গাধা ......

সজিবের এমন করতে দেখে তার নানী আতংকে শিউরে উঠলেন। পাগল ছেলেটার সাথে থেকে তার আদরের নাতিটাও শেষে কি পাগলই হয়ে গেলো। তিনি ধমক দিয়ে বললেন,

- সারাদিন কিসের এতো জিকির করছিস তুই?

- জিকির নয় নানী ফিকির করছি। মানুষ কিভাবে পশু হয় তাই নিয়ে ভাবছি।

কথাটা বলেই সজিব নানীর দিকে তাকিয়ে হালকাভাবে হাসলো। তার মুখে সুস্থ মানুষের মতো সুন্দর হাসি দেখে নানী আশ্বস্ত হলেন। পাগলু মামা যেভাবে পাগলের মতো হাসে এ হাসি তেমন নয়। স্বাভাবিক স্বরে তাই তিনি বললেন,

- পশুর মতো কাজ করলেই মানুষ পশু হয়।

নানী নিতান্ত গুরুত্বহীনভাবে কথাটা বললেও সজিব সেটা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করলো। নানীর দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলল,

- কোন কাজ করলে মানুষ পশুর মতো হয়ে যায়?

তার নানী এবার অবাক হয়ে বলেন,

- সেটা কি আর আমি বলতে পারি। আমি হলাম মুর্খ মানুষ। কুরআন পড়, হাদীস পড় তাহলেই জানতে পারবি।

নানীর কথাটা সজিবের অন্তরে যেনো ঘন্টা বাজিয়ে দেয়।

- তাইতো! কুরানিক চশমার রহস্য বুঝতে হলে তো কুরআন-হাদীসই পড়া উচিৎ।

সাথে সাথেই ওজু করে সে একটা কুরআন শরীফ নিয়ে বসে যায়। ছোট বেলায় তাদের এলাকার ইমাম সাহেবের কাছে আরবী হরফে কুরআন পড়ার বিদ্যাটা রপ্ত করেছিলো সে। পরে আর খুব একটা চর্চা করা হয়নি। তবু টেনেটুনে মিনিটে দু-এক লাইন পড়তে পারে। সেভাবেই ভাঙা ভাঙা গলায় কুরআন পড়তে থাকে সজিব। ল্যাবরেটরী থেকে পাগলু মামা সজিবের কান্ড কারখানা লক্ষ্য করলেন। কাছে এসে বললেন,

- এইটা কি হচ্ছে?

কিছুক্ষণের জন্য পড়া থামিয়ে সজিব বলে,

- গবেষণা হচ্ছে মামা গবেষণা।

মামা বিশ্মিত হয়ে বলেন,

- কিসের গবেষণা!

- নানী বলল মানুষ কিভাবে পশু হয় কুরআন পড়লে তা জানা যাবে। তাই আমি কুরআন পড়ছি।

কথাটা শুনেই মামা হি হি করে হেসে উঠলেন। এভাবে হাসলে পাগলু মামাকে দেখতে সত্যিকার পাগলের মতোই লাগে। সজিব তাই বিরক্ত হয়ে বলে,

- এভাবে হাসছো কেনো?

হাসি না থামিয়েই মামা বলেন,

- তুই একটা আস্ত গাধা। আরবীতে কুরআন পড়লে তুই কি তার অর্থ বুঝতে পারবি?

এতক্ষণে সজিব সমস্যাটি বুঝতে পারে। কিছুক্ষণ ভেবে বলে,

- তাহলে কুরআন বুঝবো কিভাবে?

- যারা আরবী জানে তাদের প্রশ্ন করতে হবে।

কথাটা বলেই পাগলু মামা এমন ভাব করেন যেনো বেশ জটিল একটা সমস্যার সহজ সমাধান করে ফেলেছেন। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে আরবী জানা লোক দেশের আনাচে কানাচে ঘুর ঘুর করছে। যে কাউকে প্রশ্ন করলেই উত্তর পাওয়া যাবে। কিন্তু সজিব জানে বিষয়টা অতটা সহজ নয়। বর্তমানে ইংরেজী ভাষার এতো বেশি চর্চা করা হয় তবু ভাল ইংরেজী জানা লোক খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হয়ে যায়। আর আরবী ভাষা তো সাধারনত কেউ চর্চাই করে না। অতএব, তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো ভালো আরবী জানা লোক খুঁজে পাওয়া বেশ কষ্টকর হবে। মামাকে সমস্যাটি খুলে বললে তিনি বললেন,

- যে কোনো জিনিসই খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবু খুঁজতে হয়। খুঁজতে খুঁজতে এক সময় পাওয়া যায়। ঐ যে, কোন কবি যেনো ছাই দেখলে তার মধ্যে অমূল্য রতন খুঁজতে বলেছেন।

সজিব হেসে বলে,

- কিন্তু তিনি নিজে হয়তো কখনই ছাই উড়িয়ে রতন খোঁজেন নি। খুঁজলে বুঝতেন ছাই উড়ালে কয়লা পাওয়া যায় হীরা-মনি পাওয়া যায় না।

মামা গম্ভীর হয়ে বললেন,

- আরে কয়লা আর হীরার গঠন কিন্তু খুব কাছাকাছি। সামান্য একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমেই কয়লা থেকে হীরা তৈরী করা যায়। এই কবি দেখছি বিরাট বড় বিজ্ঞানী ছিলো।

সজিব তাচ্ছিল্য করে বলে,

- বিজ্ঞানী না ছাই! এই কবি নিশ্চয় তোমার মতো বিরাট বড় পাগল ছিল।

এসব কথায় মামাকে কিন্তু মোটেও দামানো গেলো না। তিনি ছাই উড়িয়ে রত্ন খোঁজার পরিকল্পণাটিই গ্রহণ করলেন। সজিবকে নিয়ে আরবী জানা লোক খুঁজতে বের হলেন। বাড়ি থেকে বের হয়ে যাকে সামনে পেলেন তাকেই বললেন,

- আপনি কি আরবী জানেন?

তাদের মধ্যে অনেকে আরবী কি সেটাই চিনতে পারলো না। কেউ আবার বলল,

- আরবী তো জানি না তবে এ,বি জানি।

মামা বিরক্ত হয়ে বলেন,

- এ,বি মানে?

- এ বি মানে এ, বি, সি, ডি .....

শেষ পর্যন্ত বলার আগেই মামা তাকে ছেড়ে অন্য কাউকে প্রশ্ন করার জন্য রওয়ানা হন।

একজন বৃদ্ধ খুব উৎসাহ নিয়ে বলল,

- আমরা সেই ছোট বেলায় আরবী শিখেছি।

মামা তখন ভীষণ উৎসাহ নিয়ে বললেন,

- আপনি আরবীতে কথা বলতে পারেন?

লোকটি বলল,

- বলতে পারি, লিখতে পারি, মানুষকে শিখাতেও পারি।

- একটু বলুন তো।

- লোকটি এবার আলিফ, বা, তা, ছা থেকে শুরু করে হা, হামযা, ইয়া পর্যন্ত এক নাগাড়ে বলে দিলো।

আর সাথে সাথেই সজিব হি হি করে হেসে উঠলো। পাগলু মামা চোখ কটমট করে তাকিয়ে বললেন,

- কিরে হাসছিস কেনো? এই লোক তো আরবীই বলছে।

সজিব মামাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলে। এ, বি, সি, ডি শেষ পর্যন্ত পড়া যে ইংরেজী বলা হিসেবে গণ্য নয় সেটা বুঝিয়ে দিতেই মামা নিজেই এবার হেসে বলেন,

- ছাইয়ের মধ্যে তো দেখছি কেবলই কয়লা পাওয়া যাচ্ছে হীরা তো পাওয়া যাচ্ছে না।

- কয়লা না মামা শুধুই ময়লা। কয়লা দিয়েও তো উনুন জ্বালানো যায় কিন্তু এরা যতটুকু আরবী জানে তাতে মোমবাতিও জ্বলবে না।

- তাহলে এখন কি করা যায়?

কি করা যায় সেটা নিয়ে সজিব নিজেও ভাবছে। কিন্তু কোনো কূল কিনারা করতে পারছে না। হঠাৎ তার মনে হলো, আশে পাশে কোনো বড় মাদ্রাসা থাকলে সেখানে যাওয়া যায়। আরবী জানা দু'একজন ছাত্র বা শিক্ষক সেখানে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। তার এ প্রস্তাবে পাগলু মামাও রাজি হলেন।

খোঁজ খবর করে জানা গেলো, আশে পাশে নয়, প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে খুব বড় একটা মাদ্রাসা আছে। দেশ নন্দিত এবং বিশ্ব বিখ্যাত আরবী, উর্দু আর ফার্সী ভাষায় অতি মাত্রায় দক্ষ সব উস্তাদরা সেখানে পড়ায়। মতি হুজুরের মতো না বুঝে তারা কুরআন পড়ে না বরং কুরআনের শানে নুযুল আর অর্থ সহ তাফসীর বুঝেই তারা কুরআন পড়ে। ছাত্রদেরও এভাবে অর্থ সহ বুঝিয়ে পড়ায়। অতএব সেখানে গেলে কুরানিক চশমার রহস্য উদ্ধার করা সম্ভব হবে এটা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়।

পরদিনই পাগলু মামা সজিবকে সাথে নিয়ে বড় মাদ্রাসাটির দিকে রওয়ানা হলেন। প্রথমে বাস তার পর ভ্যান এবং শেষে কিছুক্ষণ হেটে তারা মাদ্রাসায় পৌঁছালো। মাদ্রাসার প্রধান ফটকে বিশাল আরবী সাইনবোর্ড দেখে সজিবের তাক লেগে গেলো। সেখানে আরবীতে বড় আকারে লেখা আছে, (جامعة فضلميا)। মাদ্রাসার নাম লেখা আছে। কেবল হরফগুলো আছে, যের যবর নেই। সজিব তবু কষ্ট করে পড়ার চেষ্টা করে,

- জামিয়া ফাজলামিয়া!

সজিব মনে মনে ভাবে,

- এ কেমন নাম? এখানকার ছাত্ররা কি জমিয়ে ফাজলামী করে?

পাশে একটা তরুণ দাড়িয়ে ছিলো। বেশ ভুষা এবং আকার আকৃতি দেখে বোঝা যায় এই মাদ্রাসারই ছাত্র। বোধ হয় সে সজিবের পড়া শুনেছিলো এবং তার মনের ভাব অনুভব করতে পারছিলো। এগিয়ে এসে বলে,

- ফাজলামিয়া নয়, ফজল মিয়া।

এতক্ষণে পাগলু মামা এই আলোচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিশ্ময় প্রকাশ করে বলেন,

- এর মানে?

ছাত্রটি কিছুক্ষণ ইতস্তত করে এবং কয়েকবার ঢোক গিলে বলে,

- আরবীতে ফজল মানে দয়া বা অনুগ্রহ আর মিয়া মানে একশো। অতএব এর অর্থ হলো, আল্লাহর শত শত অনুগ্রহ। আর জামেয়া মানে বিশ্ববিদ্যালয়। অর্থাৎ জামেয়া ফজল মিয়া অর্থ হলো আল্লাহর শত শত অনুগ্রহের বিশ্ববিদ্যালয়। এক কথায় বলা যায় আল্লাহর দান বিশ্ববিদ্যালয়।

কথাটা বলেই ছেলেটা প্রস্থান করে। ব্যাখ্যা শুনে পাগলু মামা অত্যন্ত খুশি হলেন। খুশিতে গদগদ হয়ে বললেন,

- দেখ সাজু, তোকে না বলেছি ছাইয়ের ঢিবিতেও রত্ন পাওয়া যায়। আরবী ভাষায় ছেলেটার কেমন জ্ঞান দেখেছিস?

পাগলু মামার এই এক দোষ। প্রশংসা করতে গিয়ে প্রায়ই তিনি বদনাম করে ফেলেন। ছেলেটার জ্ঞান গরিমা দেখে সজিবও হতবাক হয়েছে বটে কিন্তু এতবড় একটা মাদ্রাসাকে ছাইয়ের ঢিবি হিসেবে আখ্যায়িত করা নিশ্চয় সঠিক নয়। মামাকে সংশোধন করে তাই সে বলে,

- এমন একটা মাদ্রাসায় আরবী জানা কিছু ছাত্র থাকবে তাতে অবাক হওয়ার কি আছে? এটা কি ছাইয়ের ঢিবি হলো? এ হলো রত্নের খনি। আমি তো ভাবছি, আরবী শেখার জন্য এখানেই ভর্তি হয়ে যাবো।

হঠাৎ সজিবের কানে এলো কেউ একজন হি হি করে হাসছে। প্রথমেই সে তার পাগলু মামার দিকে দৃষ্টি দিলো। কিন্তু না, তিনি হাসছেন না। এদিক সেদিক তাকাতেই সজিব লক্ষ্য করলো অদূরে একটা আধা বয়স্ক লোক। বেশ ভূষা দেখে বোঝা যায় তিনিও একজন ছাত্র বা শিক্ষক। সজিবের সাথে চোখা চোখি হতেই লোকটি বলে ওঠে,

- এরা আরবীর কি বোঝে? এরা কি মিয়াতে আমেল মুখস্থ বলতে পারবে?

সজিব তার কথার আগা মাথা কিছুই বুঝলো না। তবে পাগলু মামা এমন ভাব করতে লাগলেন যেনো তিনি সব কথা বুঝতে পারছেন। ডানে বায়ে মাথা ঝাকিয়ে তিনি বললেন,

- মোটেও না।

মামার সম্মতি পেয়ে লোকটি অধিক উদ্দীপনা নিয়ে বলতে থাকলো,

- চৌদ্দ সীগা, মিয়াতে আমেল এসব আমার ঠোটের আগায়। আপনাদের বোকা বানানো সম্ভব কিন্তু আমাকে তো কেউ বোকা বানাতে পারবে না।

পাগলু মামা আবারো বোকার মতো মাথা নেড়ে বলেন,

- মোটেও না।

আবারো উৎসাহি পেয়ে লোকটি এবার মূল প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করে,

- এই যেমন ধরুন ঐ বদমাশ ছেলেটা ভুল ব্যাখ্যা করে আপনাদের বোকা বানিয়ে গেলো কিন্তু আপনারা কিচ্ছু বুঝতে পারলেন না। কিন্তু আমাকে কি এমন বোকা বানাতে পারবে?

পাগলু মামা তার কথায় সায় দিয়ে আবারো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সজিব তাকে থামিয়ে বলে,

- কিভাবে আমাদের বোকা বানালো?

লোকটি তাচ্ছিল্য করে বলে,

- বুঝলেন না? ঐ যে ফজল মিয়া। বলল না, ফজলে মিয়া মানে শত শত অনুগ্রহ?

সজিব সম্মতি জানায়?

- জী হ্যাঁ।

লোকটি হেসে বলে,

- কিন্তু আসলে তো তা নয়।

তাহলে আসলে কি?

লোকটি এবার বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বোঝায়,

- আসলে ফজল মিয়া হলো এই অঞ্চলের একজন কোটিপতির মরহুম পিতার নাম। এই মাদ্রাসা তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য খরচের বেশিরভাগ এখনও মিয়া বাড়ি থেকেই বহন করা হয়। সবাই যাতে বিষয়টা বুঝতে পারে তাই মাদ্রাসার নামের সাথে তারা এই নাম লাগিয়ে দিয়েছে। লিখেছে, ফজল মিয়া মাদ্রাসা। এটা কোনো উচিৎ কথা হলো? মাদ্রাসা কি কারো বাপের সম্পত্তি?

পাগলু মামা আবারো মাথা নেড়ে বলেন,

- মোটেও নয়।

সজিব বাধা দিয়ে বলে,

- কিন্তু উনি যে বললেন এর অর্থ শত শত অনুগ্রহ।

- ভুল বলেছে, মিথ্যা বলেছে। আরবীতে মিয়া মানে শত। তার বানান আলাদা। মাঝে হামজা, শেষে গোল তা ইত্যাদি। তাছাড়া শত অনুগ্রহ বলতে হলে আরবীতে মিয়াতে ফজল বলতে হবে ফজল মিয়া বললে হবে না।

সজিব অবাক হয়ে বলে,

- তাহলে উনি মিথ্যা কেনো বললেন?

- এভাবে কারো বাপের নামে মাদ্রাসা হলে অনেক পাবলিক আপত্তি করে অন্য কেউ দান-টান করতে চায় না। এক জনের দানে তো আর এত বড় মাদ্রাসা চলে না। তাই মানুষকে এভাবে ভুল বোঝানো হয়।

কথাটা বলে লোকটা বিজয়ীর হাসি হেসে বলে,

- এবার বলুন তো, এই মাদ্রাসার ছাত্র বা শিক্ষকরা কি আমার চেয়েও বেশি আরবী জানে?

পাগলু মামা আবারো কিচ্ছু না বুঝে বলে উঠলেন,

- মোটেও না।

লোকটি দুই চোয়াল শক্ত করে বলল,

- আর এই আমাকে কিনা মাদ্রাসার আরবী শিক্ষক পদ থেকে বহিষ্কার করে। এবার শেখা আরবী কেমন পারিস।

সজিব এবার পুরো ব্যাপারটি বুঝতে পারে। মাদ্রাসার নাম নিয়ে হুজুররা আসলেই ফাজলামী করেছে। দুনিয়ায় নাম কিনতে চায় এমন একজন মানুষের কাছে টাকা নিয়ে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে মাদ্রসার নামের মধ্যে তার নাম লাগিয়ে দিয়েছে। পরে অন্য মানুষেরা যাতে নাখোশ হয়ে দান করা বন্ধ না করে দেয় সেই উদ্দেশ্যে এই নামের মিথ্যা অর্থও বানিয়ে নিয়েছে। আবার অন্য একজন নিজে মাদ্রাসার শিক্ষক পদ থেকে বাদ পড়ার কারণে হিংসার বশবর্তী হয়ে এসব কাহিনী ফাস করে দিচ্ছে। অনেকটা চোরে চোরে ঝগড়া হলে যেমনটা হয়। সব দেখে শুনে সবিজের মনটা বিষিয়ে উঠলো। নিজের অজান্তেই বলে উঠলো,

- একেই বলে ধর্ম ব্যবসা।

সজিবকে একথা বলতে শুনে পাগলু মামা অহমিকা প্রদর্শন করে বলেন,

- আমি না তোকে আগেই বলেছি সবাই ধর্মের নামে ব্যাবসা করে?

পাগলু মামা একথা বলেছেন বটে কিন্তু তিনি কতটুকু বুঝে বলেছেন সেটাই ভাববার বিষয়। কিন্তু ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সাথে কটাদিন চলাফেরা করে সজিব এই কথার চাক্ষুস প্রমাণ পেয়ে গেছে। এখন এই বিরাট মাদ্রাসা, এর বর্তমান ছাত্র-শিক্ষক এবং মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কৃত এই আরবী শিক্ষকের উপর সজিবের তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি হয়। ইচ্ছা হয় এদের সবার মুখে থুথু নিক্ষেপ করতে। কিন্তু তা করতে গেলে ব্যাপক গন্ডগোল হতে পারে। অতএব সজিব নিজেকে সামলে নেয়। হতাশ হয়ে বলে,

- মামা চলো বাড়ি ফিরে যায়।

পাগলু মামা কিন্তু ভিন্ন কথা ভাবছেন। এতবড় ফাজলামীটা যে ব্যক্তি পরিচালনা করছে অর্থাৎ এই মাদ্রাসার মুহতামিম কুরানিক চশমাতে তার প্রকৃত রূপ কি হয় সেটা না দেখে তার বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। সজিবকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন,

- এসেছি যখন অকারণে ফিরে যাবো কেনো? চলো ভিতরে ঢুকে প্রশ্নগুলো করেই আসি। কিছু একটা উত্তর তো আসতেও পারে।

সজিবও ভাবে, তাই তো। প্রশ্ন করতে দোষ কি?

মাদ্রাসার ভিতরে ঢুকে একজন ছাত্রকে পাগলু মামা জিজ্ঞাসা করলেন,

- মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক কে?

ছাত্রটি অদূরে একটি কক্ষের দিকে ইশারা করে বলল,

- ঐ যে, মুহতামিম সাহেবের ঘর।

সজিব বুঝলো, এর অর্থ আরবীতে প্রধান শিক্ষক মানে হলো মুহতামিম। তারা দুজনে দ্রুত হেটে মুহতামিম সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করলো। সজিব সালাম দিতেই মুহতামিম সাহেব অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে উত্তর দিলেন,

- ওয়া আলাইকুম আস-সালাম।

তারপর এমন ভাব করতে লাগলেন যেনো তার আদরের মেয়ে-জামাই বাড়িতে এসেছে।

- কেমন আছেন? বসুন, বসুন।

সজিব ডানে বায়ে তাকিয়ে দেখলো, মাটিতে তোষক পেতে সুন্দর করে বসায় জায়গা প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে তাদের বসার মতো যথেষ্ঠ জায়গা অবশিষ্ট নেই। যেহেতু সেখানে কয়েক জন লোক ভিড় করে বসে রয়েছে। তারা একটু সরে নড়ে না বসলে নতুন করে কেউ বসতে পারবে না। তারা দুজন তাই হা করে মুহতামিম সাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকে। ব্যাপার বুঝতে পেরে মুহতামিম সাহেব উপস্থিত লোকগুলোকে ধমক দিয়ে বললেন,

- মেহমানদের বসার ব্যবস্থা করো।

তার ধমকে দ্রুত কাজ হলো। কেউ কেউ নিজ স্থান থেকে একটু সরে গেলো আর দু'এক জন উঠে চলে গেলো। তাতে বসার জন্য যথেষ্ট জায়গা হয়ে গেলো। এই অতিভক্তি দেখে সজিবের মনটা খুতখুত করতে থাকে। এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান তাদের

মতো দুজন সাধারন মানুষকে এভাবে সমাদর করছে দেখে সজিব ভীষণ অবাক হয়। সে ভাবে,

- সব হুজুর অহংকারী নয়। কিছু অতিভদ্র ও অমায়িক প্রকৃতির হুজুরও জগতে আছে।

মুহতামিম সাহেবের মন মগজে তখন অন্য হিসাব চলছে। এরকম দু এক জন আগন্তুক তার মাদ্রাসায় প্রায়ই আসে। হাজার হাজার টাকা-পয়সা দান করে তারা। কেউ আবার আস্ত গরু-ছাগল সদকা করে। সজিব আর পাগলু মামার দিকে দৃষ্টি দিয়ে তাই তিনি বোঝার চেষ্টা করেন তারা কি পরিমাণ দান করতে পারে। তিনি জানেন পাগল টাইপের লোকদের একটু বুঝালেই হাজার হাজার টাকা দান করে দেয়। তাই পাগলু মামাকে দেখেই তার চোখদুটো চকচক করতে থাকে। অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে বলেন,

- আপনাদের জন্য কি করতে পারি?

কি বলা যায় সজিব মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছিল তারই ফাঁকে হঠাৎ পাগলু মামা পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে মুহতামিম সাহেবের হাতে ধরিয়ে দিলেন। আর সাথে সাথেই মুহতামিম সাহেব ফিক করে হেসে উঠলেন। কাগজে উপর থেকে নিচে পর পর লেখা আছে, গরু, ছাগল, গাধা। গরু এবং ছাগলের বিষয়টা মুহতামিম সাহেবের নিকট স্পষ্ট বুঝে আসলো কিন্তু গাধার বিষয়টা ভালো মতো বুঝতে পারলেন না। এ যাবৎ মাদ্রাসায় কেউ গাধা দান করেছে বলে তিনি শোনেননি। তবে কোথাও কোথাও উট দান করার কথা শোনা যায়। সে হিসেবে গাধা দান করলেও তাতে আপত্তির কিছু থাকে না তাই তিনি মুখ তুলে এক গাল হেসে বলেন,

- কয়টা করে?

কয়টা করে কথাটা শুনে সজিব অবাক হলেও পাগলু মামা মোটেও অবাক হলেন না। তিনি স্বাভাবিক ভাবে বলেন,

- একজন গরু, একজন ছাগল আর একজন গাধা।

একটি না বলে একজন বলায় মুহতামিম সাহেবের নিকট একটু বেমানান মনে হয়। মনে মনে ভাবেন,

- পাগল টাইপের লোকেরা ঠিকমতো কথাও বলতে পারে না।

কিন্তু মুখে কিছুই বলেন না। দাতাদের সামনে দানের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে হয় না। তাহলে তারা ভাববে মুহতামিম সাহেব লোভী মানুষ। মুহতামিম সাহেবের নিরাবতার মাঝেই সজিব তার মামার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে,

- এই লিস্ট দিয়ে কি হবে?

পাগলু মামা তার দিকে তাকিয়ে বলেন,

- কেনো এগুলোর অর্থ কি তা লিখে নেবো।

এগুলোর অর্থ কি সেটা লিখার কথা শুনেই মুহতামিম সাহেবের মনের মধ্যে আরো একবার ঝিলিক খেলে যায়। তিনি তড়িঘড়ি করে কাজ শুরু করেন,

- গরু আশি হাজার টাকা, ছাগল দশ হাজার টাকা আর গাধা .....

এতদূর বলেই তিনি থেমে যান। গরু ছাগলের কারবার তারা প্রায়ই করেন তাই সেগুলোর দাম জানেন কিন্তু গাধা কখনও কেনা-বেঁচা করেননি। তাই গাধার দাম তিনি জানেন না। কিন্তু তিনি দমে যাওয়ার পাত্র নন। ডজন খানেক গরু ছাগলের ব্যাপারীর সাথে তার যোগাযোগ আছে। তারা কেউ গাধার দাম জানলেও জানতে পারে। তিনি তাই একে একে সবার সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করতে শুরু করেন। কিন্তু তারা কেউই গাধার দাম বলতে পারলো না। উল্টো তাদের কেউ হয়তো তাকেই গাধা বলে গালি দিলো। সজিব শুনলো ফোন কেটে দেওয়ার পর মুহতামিম সাহেব বলছেন,

- আমি গাধা হবো কেনো, তুই গাধা তোর বাপ গাধা ....

কি হচ্ছে তা বুঝতে সজিবের বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো। পরে যখন সে বুঝতে পারলো মুহতামিম সাহেব আসলে আরবী অর্থের বদলে গরু ছাগলের দাম বলতে শুরু করেছেন তখন তার যে কি হাসি পেলো। কিন্তু খুব কষ্ট করে হাসি চেপে রেখে সে বলল,

- মামা আসলে এগুলোর আরবী অর্থ জানতে চেয়েছে।

সজিবের কথা শুনে মুহতামিম সাহেব হা করে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকলো যেনো তার কথার আগা মাথা কিছুই তিনি বুঝতে পারছেন না। তাকে বোঝানোর জন্য সজিব আবার বলে,

- এসব শব্দের আরবী শব্দার্থ কি সেটা জানতে চাচ্ছি আমরা।

মুহতামিম সাহেব এতক্ষণে ঘটনা বুঝতে পারেন। কোথা থেকে দুজন পাগল এসেছে গরু, ছাগল আর গাধার আরবী অর্থ জানতে। আর তিনি মনে করেছেন তারা মাদ্রাসায় গরু-ছাগল দান করবে তাই তা কিনতে কত অর্থ লাগবে তা জানতে চাচ্ছে। রাগের চোটে তার মাথার ঘিলু গরম হয়ে আসে। কাগজটা এমনভাবে মামার হাতে ফেরত দেন যে, সজিব ভীষণ অপমান বোধ করে। পাগলু মামাও সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। তাচ্ছিল্যের সাথে বলেন,

- তার মানে আপনি এসব শব্দের আরবী অর্থ জানেন না?

মামার কথাটা শুনে মুহতামিম সাহেবের গরম ঘিলু বোধ হয় বাষ্পিভূত হয়ে যায়। রাগের চোটে তিনি ফোস ফোস করতে থাকেন। সজিব ভাবে,

- লোকটি দান পাওয়ার লোভে এতক্ষণ ভাল আচরণ করছিলো এখন তার প্রকৃত রুপ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে।

প্রকৃত রুপের কথা মনে হতেই কুরানিক চশমার কথা মনে পড়ে তার। এই লোকটির প্রকৃত রুপ কি সেটা দেখার তীব্র ইচ্ছা জাগে সজীবের মনে। ইশারায় সজিব মামাকে চশমাটি দিতে বলে। চশমাটি সজিবের হাতে দেওয়ার সাথে সাথেই মুহতামিম সাহবের নজরে পড়ে যায়। তিনি চেচিয়ে বলেন,

- এটা কি?

সজিব শান্তভাবে বলে,

- এটা একটা চশমা।

উদ্ভট চশমাটি দেখে মুহতামিম সাহেব দারুণ অবাক হলেন। এতই অবাক হলেন যে রাগের কথা অনেকটা ভুলেই গেলেন। বিশ্ময় প্রকাশ করে বললেন,

- কার চশমা এটা?

- আমার।

সজিবের কথা শুনে মুহতামিম সাহেব আরো অবাক হলেন।

- এতটুকু বয়সে এত বড় চশমা!

- আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার চোখের সমস্যাও অনেক বড় তো তাই এত বড় চশমা ব্যবহার করতে হয়।

পাশ থেকে একজন লোক বলে,

- তুমি কি চোখে দেখো না?

তার দিকে তাকিয়ে সজিব বলে,

- হ্যাঁ হ্যাঁ চোখে তো অবশ্যই দেখি।

মুহতামিম সাহেব এবার ধমকে ওঠেন,

- তবে সমস্যাটা কি?

সজিব তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলে,

- সমস্যা হলো, খালি চোখে আমি সবাইকে মানুষ মানুষ দেখি। আসল রুপ দেখতে পারি না।

সজিবের কথার আগা মাথা কিছুই মুহতামিম সাহেব বুঝতে পারেন না। চেয়ারে বসে তিনি রাগে ফুসতে থাকেন। সেই ফাঁকে সজিব তার চোখে বিশাল চশমাটি পরে নেয়। মুহতামিম সাহেব রাগত দৃষ্টিতে সজিবের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর তার প্রকৃত রুপ দেখে সজিব চমকে ওঠে। সে দেখে একটা সুবিশাল ড্রাগন। মুখ দিয়ে যার আগুন ঝরছে। চামড়া ভেদ করে দেখা যাচ্ছে পেটের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ড্রাগনটি রাগে ফোস ফোস করছে। এমনভাবে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে যে মাঝে মাঝে নাক মুখ দিয়ে আগুন বের হয়ে মাটিতে পড়ছে। ড্রাগনটি আবার চেটেপুটে সেই আগুন খেয়ে নিচ্ছে। নিজের অজান্তেই সজিব বলে ওঠে,

- কি ভয়ানক, কি ভয়ংকর।

ভয়ে সজিবের মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা হয়। তাড়িঘড়ি করে সে চশমাটি খুলে ফেলে আর পাগলু মামার হাত ধরে টানতে টানতে দ্রুত বাইরে চলে আসে। মামা অবাক হয়ে বলেন,

- কি হলো?

- বাড়ি ফিরে চলো সব বলছি।

ফেরার পথে দরজার নিকট সেই বহিষ্কৃত আরবী শিক্ষককে দেখা গেলো। অনেক্ষণ থেকে তিনি মাদ্রাসার দরজার সামনে দাড়িয়ে আছেন। সুযোগ পেলেই যে কারো সাথে মাদ্রাসার নিন্দা-মন্দ করে মনের জ্বালা মেটাতে চান তিনি। সজিবদের বের হতে দেখে এক গাল হেসে বলেন,

- কি? প্রশ্নের উত্তর পেলেন?

তাকে দেখেও সজিবের খুব ঘৃণা হয়। মনে হয় এও হয়তো একটা ড্রাগন অথবা হায়েনা অথবা অন্য কোনো হিংস্র পশু। চশমা চোখে দিয়ে দেখতে ইচ্ছা হয় না। পাগলু মামা অবশ্য আক্ষেপ করে বলেন,

- সব কটা গাধা। কোনো প্রশ্নের উত্তরই দিতে পারলো না।

লোকটা ভীষণ খুশি হয়ে বলে,

- বলেছিলাম না, এরা কিছুই জানে না?

পাগলু মামা আগ্রহী হয়ে বলে,

- আপনি কি সব জানেন?

সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তর না দিলেও লোকটি এমন ভাব করে যেনো সে আসলেই সব কিছু জানে। পাগলু মামা তখন হাতের কাগজটি তাকে দেখিয়ে বলে,

- এগুলোর আরবী অর্থ বলতে পারবেন?

লোকটি এক নজরে তালিকাটি পাঠ করে এক গাল হেসে বলে,

- এ আবার কোনো ব্যাপার হলো? গরু আরবী হচ্ছে বাকারুন, ছাগল হলো গনামুন আর গাধা হলো হিমারুন।

সজিব ভাবে এই ফাঁকে তাকে একটা প্রশ্ন করেই ফেলি। সে বলে,

- আচ্ছা, ড্রাগন আরবী কি?

লোকটা যেনো আকাশ থেকে পড়লো। ড্রাগন শব্দের আরবী তো দূরের কথা এর বাংলা কি সেটাই তার জানা নেই। তড়িঘড়ি করে তাই বলে উঠলো,

- এটা আবার কি?

পাগলু মামা তাকে বুঝিয়ে বলেন,

- রুপ কথার একটা জন্তু। মুখ দিয়ে আগুন বের হয়।

লোকটা মাথা নাড়লো,

- এমন জন্তুর নাম তিনি বাবার জনমেও শোনেননি।

তারপর তাড়াতাড়ি বিদাই নিয়ে লোকটি কোনো রকমে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করলো।

পাগলু মামার চেহারা পাগল পাগল হলেও তিনি বিজ্ঞানী মানুষ। সজিবের মুখে প্রথমে ড্রাগনের নাম শুনে তিনি বুঝে নিলেন তার চশমায় মাদ্রাসার মুহতামিমকে এই রুপে দেখা গেছে। চোখ কপালে তুলে তিনি বলে ওঠেন,

- ওরে বাবা! এবার তাহলে গরু, ছাগল আর গাধার দলে একজন ড্রাগন ভিড়লো। পশুদের ভুবনে তাকে সুস্বাগতম।

সব দেখে শুনে মামা বেশ গর্ব অনুভব করছেন। যেহেতু তিনি পশু হলেও হয়েছেন গরু। আর সবাই হয়েছে ছাগল, গাধা বা ভয়ংকর ড্রাগন। তার দৃষ্টিতে এদের মাঝে গরুই শ্রেষ্ঠ। অতএব, তার গর্ব হওয়ারই কথা।

সজিব কিন্তু খুশি হতে পারে না। গরু বা ছাগল হলেও পশু একটা পশুই। মানুষ রুপে জন্ম নিয়ে আজীবন পশু হয়ে থাকতে তার মন সাই দেয় না। পশুত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তায় সে তালাশ করতে তাকে। কিন্তু সামনে যতই অগ্রসর হচ্ছে রহস্য ততই ঘনিভূত

হচ্ছে আর সমাধানের পথ জটিল হয়ে যাচ্ছে। এই কুরানিক চশমার রহস্য সে আদৌ সমাধান করতে পারবে কিনা সেটা সে এখনও জানে না। হঠাৎ তার মনে একটা প্রশ্ন জাগে। পাগলু মামাকে বলে,

- আচ্ছা মামা। চশমাটা তো তুমিই বানিয়েছো। এর কার্যক্রমের ব্যাখ্যাও তো তোমার জানার কথা। তুমিই একটু চেষ্টা করে দেখো না।

পাগলু মামা লাজুক ভঙ্গিতে হেসে বলেন,

- তুই তো আমার খবর সবই জানিস। আমি নিজে কিছুই আবিষ্কার করি না। বিভিন্ন বই পুস্তক ঘেটে ঘুটে নানা নতুন ফর্মুলা খুঁজে বের করি তারপর সেটা বাস্তবে প্রয়োগ করি। এই চশমার ফর্মুলাটাও আমার আবিষ্কার নয়। বহু পুরোনো একটা বই থেকে আমি এই ফর্মুলা পেয়েছি। পরে ধীরে ধীরে নানা জিনিস সংগ্রহ করে নিয়ম মতো সংযুক্ত করে আমি এটা বানিয়েছি। প্রথমে বিশ্বাসই করিনি এতে কোনো কাজ হবে। কিন্তু এখন দেখছি অসাধারন কাজ হচ্ছে। কিন্তু এটা কিভাবে কাজ করে সে বিষয়ে আমি বলতে গেলে কিছুই জানি না।

মামার কথাটা শুনে সজিব প্রথমে একটু হতাশ হয় তারপর আবার উৎসাহী হয়ে বলে,

- গরু ছাগল হয়ে বসে থাকলে হবে না। যে কোনো ভাবে এর একটা বিহিত করতেই হবে।

কিছুক্ষণ নিরব থেকে সে আবার বলে,

- কুরানে গরু, ছাগল বা ড্রাগন সম্পর্কে কি বলা হয়েছে তা খুঁজে দেখতে হবে।

মামা বলেন,

- কিন্তু আমরা তো আর আরবী জানি না। কুরআনে কি আছে তা আমরা জানবো কিভাবে?

- আমি আজই বাজারে গিয়ে একটা বাংলা কুরআন নিয়ে আসবো। তারপর খুঁজে খুঁজে সব পশুদের নাম বের করবো।

পাগলু মামা কিন্তু সজিবের এই পন্থায় কাজ হবে বলে মনে করলেন না। তার মাথায় অন্য চিন্তা খেলা করছে। সজিবকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি বললেন,

- আমি নিজেই এর একটা বিহিত করবো। কয়দিনের মধ্যেই তুই দেখবি আমি গরু থেমে মানুষ হয়ে যাবো।

কথাটা বলেই মামা কোনদিকে বেরিয়ে গেলো। সজিব বের হয়ে গেলো বাজারের দিকে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটা বাংলা কুরআন শরীফ কিনলো সে। হঠাৎ তার মনে হলো

কুরআন সম্পর্কে লেখা আরও কিছু বই তার কেনা উচিৎ। কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে এসব বই কাজে আসতে পারে। খোঁজ করে কুরআনের শব্দার্থ এবং কুরানের অভিধান নামে দুটো বই কিনলো। চার পাঁচ শত টাকার মধ্যেই সব বই কেনা হয়ে গেলো। কেনা কাটা সেরে বাড়ি ফিরে এসে সে যা দেখলো তাতে চোখ চড়ক গাছে উঠে যাওয়ার মতো অবস্থা। মামা বাড়ির সামনে বহু লোকের ভিড়। দেখে মনে হয় সবাই ভিক্ষুক। কেউ ঝোলা হাতে কেউ থালা হাতে কেউ আবার কেবল খালি হাত পেতে রেখেছে। ছোট বড় ছেলে বুড়ো নানা বয়সের লোক কিচির মিচির করছে। সজিব প্রথমে ভাবলো হয়তো কোনো অঘটন ঘটেছে। তড়ি ঘড়ি করে সে তাই ভিড়ের মাঝে ঢুকে গেলো। এদিক সেদিক তাকিয়ে ব্যাপার কি বুঝার চেষ্টা করলো। হঠাৎ তার চোখে পড়লো পাগলু মামা হাতে অনেকগুলো টাকা নিয়ে মানুষের মাজে ঘুরাঘুরি করছেন আর যাকে সামনে পাচ্ছেন দশ টাকা বিশ টাকা এমনকি পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত দান করছেন। এক বৃদ্ধাকে তো তিনি পুরো একশ টাকার একটা নোট দিয়ে দিলেন। বৃদ্ধা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল,

- তুমি মানুষ হও বাবা।

তখনই সজিবের দিকে তাকিয়ে পাগলু মামা এক গাল হেসে বললেন,

- দেখলিতো, কত সহজেই মানুষ হওয়া যায়?

এতক্ষণে সজিব ব্যাপার বুঝতে পারে। গরু থেকে মানুষ হওয়ার জন্য মামা হাতেম তাঈ এর মতো দান করতে শুরু করেছেন। ইতোমধ্যে কত টাকা দান করে ফেলেছেন কে জানে। মামার যে কখন কি পাগলা খেয়াল চাপে তা বলা মুশকিল। মামার কথার কোনো প্রতিউত্তর না করে সজিব বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেলো। আর সাথে সাথেই তার নানী এসে তাকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কেদে ফেললেন,

- ওরে আমার সাজু রে। হাবুর মাথাটা এবার পুরো নষ্ট হয়ে গেছে রে। ঘরের জিনিস সব উজাড় করে পরের হাতে দিয়ে দিলো রে।

সজিব কি বলবে কিছুই ভেবে পেলো না। বইগুলো নানীর হাতে দিয়ে বলল,

- এগুলো ঘরে রাখো আমি মামাকে শামলাচ্ছি।

শামলাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসলো বটে কিন্তু পাগলু মামাকে শামলানো খুব কঠিন হলো। সজিব যতই বলে,

- মামা করছো কি?

পাগলু মামা তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলেন,

- দেখতেই তো পারছিস।

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলল। তারপর হাতের টাকাগুলো শেষ হয়ে গেলে পাগলু মামা আবার বাড়ির ভিতরে গেলেন নতুন করে টাকা আনার জন্য। বাড়ির ভিতরে ঢুকার সাথে সাথে সজিব তাকে জড়িয়ে ধরে বলল,

- মামা যথেষ্ট হয়েছে। এবার খ্যান্ত দাও। এভাবে যদি মানুষ হওয়াই যায় তবে এতক্ষণে হয়ে যাওয়ারই কথা।

সজিবের কথাটা পাগলু মামা পছন্দ করেন। গম্ভীরভাবে বলেন,

- চশমাটা পরে একটু পরখ করে দেখতো।

সজিব চশমাটা চোখে দিয়ে মামার দিকে তাকালো। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই একই চেহারা। এক চুলও পার্থক্য নেই। চশমাটা চোখ থেকে খুলতেই মামা বলে উঠলেন,

- কি দেখলি?

সজিব হেসে বলে,

- সেই গরুটা।

সজিবের কথা শুনে মামার মনটা বেজাই খারাপ হয়ে গেলো। নিচু গলায় বললেন,

- রঙ টঙও পাল্টাইনি?

সজিব মাথা নাড়ে,

- কিচ্ছু পাল্টাইনি।

মামা এবার ভিষণ ক্ষেপে গেলেন। প্রথমে চশমাটা হাতে নিয়ে আছড়ে ভেঙে ফেলতে চাইলেন। কিন্তু সজিব তার হাত চেপে ধরে ফেলল। বারবার অনুনয় করে বলল,

- নিজের তৈরী জিনিস এভাবে ভেঙে ফেলবে?

একথায় মামা চশমাটা সজিবের হাতে ছেড়ে দিয়ে বড় একটা লাঠি হাতে বাইরে বেরিয়ে এলো। লাঠি দিয়ে ইটের প্রাচীরে দুএকটা আঘাত করে হুংকার ছেড়ে বলল,

- যে যা নিয়েছে ফেরত দাও।

পাগলু মামার এমন অগ্নিরুপ দেখে কিছু লোক নিরবে টাকা ফেরত দিলো আর কিছু লোক লুকিয়ে সটকে। এতে কিছু টাকা রক্ষা পেলো বটে কিন্তু হিসাব করে দেখা গেলো হাজার দুয়েক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। নানী তবু বিষয়টাকে মেনে নিলেন। পাগল

ছেলেটার জন্য কি তার কম খরচা হয়! সে তুলনায় একটা টাকা কিছুই না। বাড়ি ফিরে এসেই পাগলু মামা তার মায়ের পা চেপে ধরে বললেন,

- মা তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি ভীষণ পাপী বিরাট অপরাধী। একারণে আমি গরু থেকে মানুষ হতে পারছি না। তুমি আমাকে মাফ করে দাও।

সজিবের নানী তড়িঘড়ি করে পা সরিয়ে নিয়ে বললেন,

- হাই আল্লাহ আমার ছেলেটা কি শেষে গাছ পাগল হয়ে গেলো?

সজিব তখন নানীকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলো,

- মামা আসলে ভাল মানুষ হতে চাচ্ছে তাই এমন করছে।

সজিবের কথা শুনে নানী কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলেন। ছেলের মুখের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বলেন,

- এমন চেহারায় কি ভাল মানুষ হওয়া যায়?

নানীর কথা শুনে সজিব নিজেও পাগলু মামার দিকে দৃষ্টি ফেলে। নানী সত্যি কথাই বলেছেন। চুল দাড়ি আর গোফে প্রায় রবিন্দ্রনাথের মতো অবস্থা। এই চেহারা দেখে যদি কেউ মামাকে গরিলা মনে করে তবু ভুল হবে না। মামাও বিষয়টি বুঝতে পারেন। মাসে যে দুই একদিন মাথা আচড়ান তখন আয়নায় নিজের চেহারা দেখে মাঝে মাজে তিনি নিজেই আতকে ওঠেন। বিনয়ের সাথে তিনি বলেন,

- তুমি বললে আমি চুল দাড়ি সব কেটে ফেলবো মা।

পাগলু মামার এই কথায় তার মা যে কি খুশি হলেন তা বলার নয়। আচল দিয়ে নিজের চোক মুঝতে মুছতে বললেন,

- চুল আর গোফ কাটবি। দাড়ি কাটবি না। তোর বাপের মুখে দাড়ি ছিলো। আহা কি সুন্দর দাড়ি। দেখে মনে হতো ফেরেশতা।

পাগলু মামা আবারো পাগলামী শুরু করলেন,

- তুমি কি ফেরেশতা দেখেছো মা?

তার মা মাথা নেড়ে বললেন,

- না বাবা, ফেরেশতা কি আর যে সে দেখতে পারে?

- তাহলে কিভাবে বুঝলে আমার বাবা দেখতে ফেরেশতার মতো ছিলো?

এই কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নানী চোখ কটমটা করে পাগলু মামার দিকে তাকালেন আর ধমক দিয়ে বললেন,

- এখনই যা। চুল আর গোফ ছেটে মানুষ হয়ে আয়।

মানুষ হওয়ার লোভে মামা তখনই পনেরো বছর ধরে পুষে রাখা চুল আর গোফ কাটার জন্য রওয়ানা হয়ে গেলো। সজিব তখন নতুন কিনে আনা বাংলা কুরআনটা নিয়ে পড়তে বসলো। পড়া কিভাবে শুরু করা যায় তাই নিয়ে ভেবে বেশ কিছু সময় ব্যায় করলো। প্রথমেই বাংলা কুরআনটি নেড়ে চেড়ে দেখলো। প্রায় পাঁচ ছয় শ পৃষ্ঠা। এতগুলো পৃষ্ঠা পড়ে কোথায় কি আছে তা বের করা বা মনে রাখা সত্যিই কঠিন ব্যাপার। কিছুক্ষণ এলোপাতাড়িভাবে পড়লো। জান্নাত-জাহান্নামের কথা, পূর্বে ঘটে যাওয়া কিছু কাহিনী, অনেক নবী বা নেককার ব্যক্তির কথা। কিন্তু গরু-ছাগল বা গাধার কথা সে কোথাও পেলো না। তার মনে হলো, এভাবে বছরের পর বছর কেটে গেলেও সমস্যার সমাধান হবে না। হঠাৎ তার মনে হলো,

- যদি বাংলা অভিধানের মতো কুরআনের মধ্যেও গ দিয়ে গাধা বের করা যেতো তবে কতই না ভাল হতো।

কথাটা মনে হতেই তার মাথায় ঝিলিক খেলে গেলো। তার মানে পড়লো আল-কুরআনের অভিধান নামে একটা বই সে আজই কিনে এনেছে। সেটা কি এমন কিছুই? কথাটা মনে হতেই সে ঘর থেকে অভিধানটি নিয়ে এসে খুলে দেখলো। সে বুঝলো তার ধারনা সঠিক। সেখানে বাংলা বর্ণমালার ধারাবাহিকতা অনুযায়ী বিভিন্ন শব্দকে সাজানো হয়েছে এবং কুরআনে কোন সূরার কোন আয়াতে উক্ত শব্দ আছে তা লেখা আছে। অনেক শব্দ কুরআনে কয়েকশ বার এসেছে আবার কোনো কোনো শব্দ এসেছে মাত্র কয়েক বার। এর সবই বইটিতে লেখা আছে। আনন্দের অতিশয্যে সজিব বলে উঠলো

- ইউরেকা।

- কিরে কোনো সমাধান পেলি?

মামার কণ্ঠ শুনে মুখ তুলে তাকাতেই সজিব চমকে উঠলো। তার পাগলু মামাকে আর চেনা যাচ্ছে না। পুরা হুজুর হুজুর লাগছে। এই প্রথম সে বুঝতে পারে নানার সাথে মামার চেহারার হুবহু মিল রয়েছে।

- এবার একটু চশমায় চোখ লাগিয়ে দেখতো কোনো উন্নতি হলো কিনা।

কথাটা বলে পাগলু মামা পাশেই রাখা একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। সজিবের মনেও সে আগ্রহের কোনো কমতি ছিলো না। তড়িঘড়ি করে উঠে গিয়ে চশমাটা নিয়ে আসলো।

তারপর চোখে দিয়ে মামার দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে মাথাটা নামিয়ে ফেলল। মামাকে সেই একই চেহারায় দেখে তার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। তার মন খারাপ দেখে পাগলু মামাও হতাশ হয়ে গেলেন। তাকে কোনো প্রশ্ন না করেই তিনি মন মরা হয়ে চেয়ারে বসে থাকলেন। মামার এমন দুঃখ দুঃখ চেহারা সজিবের একেবারে পছন্দ হচ্ছিলো না। সে ভয়ে ভয়ে বলল,

- মামা একটা কথা বলবো?

মামা মুখে কিছুই বললেন না তবে তার দিকে ফিরে তাকালেন। এর অর্থ তিনি তার কথা শুনতে চাচ্ছেন। সজিব তখন বলে,

- কুরানিক চশমা বলছে তুমি গরু। তার মানে কুরআনের দাবীতে তুমি গরু। কিন্তু তুমি তো নাস্তিক। কুরআনে বিশ্বাস করো না। তাহলে বিষয়টাকে এতো গুরুত্ব সহকারে কেনো গ্রহন করছো? যে জিনিসে তুমি বিশ্বাস করো না তা তোমাকে গরু বলুক আর ছাগল বলুক তাতে বিচলিত হওয়ার কি আছে?

পাগলু মামা ধীরে ধীরে উপর থাকে নিচে মাথা ঝাকিয়ে বলেন,

- সেই প্রশ্ন তো আমার মনেও বারবার উদয় হচ্ছে। কুরআন আমাকে গাধা বলেছে তাই আমি এতো বিচলিত হয়ে পড়েছি কেনো? আসলে কি জানিস? আমার মনে হচ্ছে আমি আসলে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।

মামার কথা শুনে সজিব যেনো আকাশ থেকে পড়লো,

- একটা কট্টরপন্থী নাস্তিক হয়েও তুমি কুরআনে বিশ্বাস করতে শুরু করেছো? কিন্তু কেনো?

- কারন খুব সহজ। কুরআনের প্রতি আমার অবিশ্বাস ছিল ভিত্তিহীন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যুক্তি।

সজিব অবাক হয়ে বলে,

- কিভাবে?

মামা এবার সজিবকে বোঝানোর জন্য বিষয়টিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন।

- মনে কর এক লোকের সাতটি ছেলে আছে। ছেলেগুলো চুরি-ডাকাতি করে, ফাঁকিবাজি করে। ছেলেদের এসব কাজ দেখে সারা গ্রামে লোকটির সুনাম হবে না বদনাম হবে।

সজিব স্বাভাবিকভাবেই বলে,

- বদনামই হবে। সবাই বলবে সে নিশ্চয় খারাপ তা না হলে কি আর তার ছেলেরা এমন খারাপ হয়।

সজিবের কথা শেষ হলে মামা বলেন,

- এখন ধর আমরা ঐ ব্যক্তির বাড়ি গেলাম, তার সাথে কথা বললাম। ছেলেদের সকল অপকর্মের কথা সে স্বীকার করলো এবং এর জন্য তাদের শেয়াল-কুকুর বলে গালি দিলো। এখন আমরা কি বলবো,

একটু ভেবে সজিব বলে,

- বলবো লোকটি সৎ ও সত্যবাদী। নিজের ছেলেদের বিরুদ্ধেও সঠিক কথাই বলে।

মামা হেসে বলেন,

- ছেলেদের অপকর্মের কারণে লোকটির ব্যাপারে আমরা যে ভুল ধারণা করেছি সেটা কি অযৌক্তিক নয়?

সজিব দৃঢ়ভাবে বলে,

- অবশ্যই।

- কুরআনের প্রতি আমার অবিশ্বাসও এমন অযৌক্তিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআনের হাফেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক, ওয়াজের মাঠের বক্তা ইত্যাদি বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্বদের অবৈধ ও অনৈক্তিক কার্যকলাপ দেখে আমি মনে করেছি এটাই বুঝি প্রকৃত ইসলাম। এদেরকে আমি ঘৃণা করেছি আর অযৌক্তিকভাবে এদের কারণে খোদ ইসলামকেই ঘৃণা করেছি। প্রকৃত ইসলাম কি তা কুরআন-হাদীস থেকে বোঝার চেষ্টা করিনি। এখন আমরা দেখছি কুরআন নিজেই এসব ভন্ড মৌলানাদের পশু হিসেবে আখ্যায়িত করছে। নিজের লোককেই কুরআন যখন ছেড়ে কথা বলছে না তখন কুরআনকে সাহসী ও সত্যবাদী বলা ছাড়া কোনো উপাই আছে কি?

মামার যুক্তিটা সজিবের বুঝে আসে। সে সম্মতি জানালে মামা বলেন,

- সেই সত্যবাদী কুরআনই আমাকে গরু আর তোকে ছাগল বলেছে। চিন্তিত হওয়ার জন্যে এটাই কি যথেষ্ট নয়?

সজিব মামার সাথে একমত হয়। গরু বা ছাগল হয়ে থাকতে সে চায় না। সে আবারও বলে,

- এর একটা ব্যাবস্থা করতেই হবে।

- কিন্তু ব্যাবাস্থা হবে কিভাবে? দেখলি না কোনো পন্থায়ই কোনো কাজ হলো না।

মামাকে হতাশ হতে দেখে সজিব সাহস যুগিয়ে বলে,

- আরে মামা, হতাশ হচ্ছো কেনো ঐ যে কোন কবি বলেছে না। একবার না পারিলে দেখো শত বার।

সজিব আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলো। কিন্তু মামা তাকে ধমক দিয়ে বলেন,

- কবিদের তো আর কোনো কাজ নেই। কেউ বলছে বারবার ছাই উড়াতে আবার কেউ বলছে একই কাজ একশ বার করতে। কিন্তু ধৈর্য্য বলে তো একটা জিনিস আছে নাকি?

সজিব মামাকে শান্তনা দিয়ে বলে,

- এটাই হবে আমাদের শেষ চেষ্টা। কুরআনে অভিধান দেখে সব পশুদের নাম বের করে আমরা বুঝার চেষ্টা করবো মানুষ কিভাবে গরু, ছাগল বা গাধা হয় ।

কুরআন অভিধানের কথা শুনে মামা কিছুটা অবাক হলেন। সজিব বিষয়টি মামাকে বুঝিয়ে দিতেই তিনি ভীষণ উৎসাহী হয়ে ওঠেন। চেয়ার থেকে তড়াক করে লাফ দিয়ে নেমে বিছানায় সজিবের পাশে বসে বলেন,

- তাহলে প্রথমে কি অনুসন্ধান করা যায়?

সজিব সাথে সাথে বলে,

- প্রথমে ছাগল।

মামা বাধা দিয়ে বলে

- উহু প্রথমে গরু।

- না, না। ছাগল।

এভাবে বিতর্ক চলতে থাকলে শেষে সমাধান করার জন্য সজিব বলে,

- গাধা দিয়ে শুরু করলে কেমন হয়?

মামা সম্মতি দিয়ে বলেন,

- তবে তাই হোক।

কুরআনের অভিধানে গাধা শব্দ বের করতেই দেখা গেলো। সমগ্র কুরআনে গাধা শব্দ আছে দুটি স্থানে। প্রথমেই একজন ব্যক্তির মৃত গাধা জীবিত হয়ে যাওয়ার বর্ণনা এসেছে। সে কাহিনী পাঠ করে সজিব বলে,

- চিন্তা করে দেখো তো কাহিনীটা মতি হুজুরের সাথে কোনো ভাবে মেলে কিনা?

পাগলু মামা এবার একটা গরুত্বপূর্ণ কথা বললেন,

- আরে গাধা! এখানে তো আসল গাধা সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে। আমাদের খুঁজতে হবে এমন একটা আয়াত যেখানে মানুষকে গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

পাগলু মামা ঠান্ডা মাথায় ভাবলে বেশ যুক্তিপূর্ণ কথা বলে। এই কথাটা তার মধ্যে একটি। সজিব তাই এই আয়াতটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয় আয়াতটি পড়তে থাকে।

- যাদের আল্লাহর কিতাব তাওরাত দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা সে অনুযায়ী আমল করেনি তাদের উদাহরণ হলো, ঐ গাধার মতো যে নিজের পিঠে কিতাবের বোঝা বহন করে (কিন্তু তার এক বর্ণও সে বোঝে না)।

আয়াতটা পাঠ করার সাথে সাথে সজিব হাতে কিল মেরে বলে,

- মতি হাফেজের সাথে এই কথা হুবুহু মিলে যায় তাই না মামা?

- কিভাবে মেলে?

এই সহজ বিষয়টা মামা বুঝতে পারছে না দেখে সজিব ধমকের সুরে বলে,

- দেখছো না? মতি হাফেজ কুরআন মুখস্থ রেখেছে কিন্তু কুরআনে অর্থ বোঝে না কুরআনে বিধান মতে আমলও করে না। হুবহু ঐ গাধার মতো যে পিঠে বই পুস্তক বহন করে কিন্তু তাতে কত মূল্যবান জ্ঞানের কথা লেখা আছে তার কোনো খবর রাখে না, সে অনুযায়ী আমলও করে না।

পাগলু মামা বিশ্ময় প্রকাশ করে বলে,

- সত্যিই তো!

সজিব গর্ব প্রকাশ করে বলে,

- তাহলে একটা বিষয় সমাধান করা গেলো, কি বলো?

পাগলু মামা সম্মতি জানান। তিনি এখন এ পদ্ধতিতে বেশ উৎসাহ অনুভব করছেন। পরবর্তী বিষয় কি হবে সেটা নির্ণয় করতে গিয়ে আবারো গরু ও ছাগল নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত বিতর্ক হলো ফলে ঠিক করা হলো ড্রাগন শব্দটি অনুসন্ধান করা হোক। সেই মোতাবেক কুরআনের অভিধানে ড্রাগন শব্দটি খুঁজে দেখতে গিয়ে সজিব ভীষণ অবাক হলো। শব্দটি নেই। অর্থাৎ কুরআনের কোনো আয়াতে ড্রাগন সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। বিড়বিড় করে সে বলে উঠলো,

- কেমন হলো?

সব শুনে পাগলু মামা কিছুক্ষণ ভেবে বললেন,

- ডাইনোসর আছে কিনা দেখতো। ড্রাগনের সাথে ডাইনোসরের অনেক মিল আছে।

সজিব অভিধান খুঁজে দেখে বলল,

- না, এটাও নেই।

পাগলু মামা হালকা হেসে বললেন,

- আশ্চর্য! চশমাটা নিজেই কি এবার ফাঁকিবাজি করলো নাকি?

সজিব কিন্তু একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। গাধার ব্যাপারটি যতটা খাপে খাপে মিলে গেছে তাতে চশমার মধ্যে কোনো ফাঁকিজুকি আছে বলে মনে হয় না। হঠাৎ তার মনে একটা ভাবনার উদয় হয়। সে বলে,

- ড্রাগন তো বাস্তব কোনো জন্তু নয়। এটা কাল্পনিক একটা জন্তু। একটা কাল্পনিক জন্তুর নাম কুরআনে থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ড্রাগনের সাথে সেতো আগুনও দেখেছে। দেখেছে মুহতামিম সাহেবের পেটে আগুন জ্বলছে এবং মুখ দিয়ে আগুন বাইরে বের হয়ে পড়ছে। আর তিনি চেটে চেটে সেই আগুন খেয়ে নিচ্ছে। এমনও তো হতে পারে একানে আসলে আগুন খেয়ে নেওয়ার বিষয়টা দেখানো হচ্ছে?

মামা কিছুক্ষণ নিরব থেকে বললেন,

- হুম। হতেও পারে।

মামার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সজিব আগুন খেয়ে নেওয়ার বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে। এ বিষয়ে দুটি আয়াত খুঁজে পাওয়া যায়। একটিতে বলা হয়েছে যারা দুনিয়াতে সুবিধা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ গোপন করে তারা আসলে আগুন খেয়ে পেটের মধ্যে ভর্তি করে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, যারা ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা আসলে আগুন খেয়ে পেটের মধ্যে ভর্তি করে। আয়াতদুটি পাঠ করে সজিব একটু ভেবে বলে,

- মাদ্রাসার শিক্ষকরা গরীব মীসকিন আর এতীম ছেলেদের নামে টাকা তোলে। মনে হচ্ছে ঐ টাকা তারা মেরে খায়।

পাগলু মামা মাথা ঝাকাতে ঝাকাতে বলেন,

- মাঝে মাঝেই পত্রিকায় এমন খবর ছাপে। দানের টাকা মেরে খেয়ে ওরা টাকার কুমিরে পরিনত হয়। দেখলি না আমরা যাওয়ার সাথে সাথেই কেমন গরু ছাগলের দাম বলতে শুরু করলো।

ঘটনাটা সজিবের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তারপরই তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মাদ্রাসার সাইনবোর্ড। সে হঠাৎ চেচিয়ে ওঠে,

- মামা, ওরা সত্যও গোপন করে। দেখলে না কিভাবে ফজল মিয়াকে শত শত অনুগ্রহ বানিয়ে দিলো?

মামা অবাক হয়ে বলেন,

- আরে তাইতো। তবে তো দেখি দুটো আয়াতই ওদের ব্যাপারে খাটে।

সজিব নিজেও বিশ্মিত হয়ে বলে,

- কি অদ্ভুদ! তাই না মামা?

মামা মাথা ঝাকিয়ে বলেন,

- তাই তো দেখছি।

তারপর মুখটা কালো করে বলেন,

- এখন বাদ আছি কেবল আমরা। গরু আর ছাগল। তাহলে গরু দিয়েই শুরু হোক।

সজিব আর আপত্তি করে না। সে অভিধানে গরু খুঁজতে শুরু করে। গাভীর কথা বেশ কিছু আয়াতে উল্লেখ করা হলেও গরুর কথা এসেছে মাত্র তিনটি আয়াতে। তার মধ্যে একটি আয়াতে বলা হয়েছে, আগের জামানায় গরু-ছাগলের মাংস খাওয়া হারাম ছিলো। আয়াতটা পাঠ করতেই মামা বলে ওঠেন,

- মাংস খাওয়া হারাম মানে গরু অত্যন্ত সম্মানিত একটি প্রাণী। দেখিস না হিন্দুরা গরুকে মা বলে?

সজিব বাধা দিয়ে বলে,

- এটা তো আর হিন্দু ধর্ম নয়, এটা ইসলাম। হিন্দুরা গরুকে মা বলে আর হনুমানকে বলে দেবতা। ইসলামে ওসব কুসংষ্কারের কোনো স্থান নেই। তাছাড়া এ বিধান ছিল আগের যুগে এখন তো ঠিকই গরু ছাগলের মাংস খাওয়া যায়। আর মাংস খাওয়া হারাম হলেই যে গরু সম্মানিত হবে এটা সঠিক নয়। যেমন শুকরের মাংস খাওয়া হারাম। শেষ কথা হলো, এখানে প্রকৃত গরু সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে মানুষকে গরুর সাথে তুলনা করা হচ্ছে না। অতএব তোমার সূত্র মতেই এই গরু সেই গরু নয়।

সজিবের যুক্তির সাথে মামা পেরে ওঠেন না। গরু সম্পর্কে অন্য আয়াতগুলোও সজিব পড়ে দেখে। তাতেও ভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কোথাও মানুষকে গরুর সাথে তুলনা করা হয়নি। গরু খুঁজতে ব্যার্থ হয়ে সজিব এবার ছাগল খুঁজতে শুরু করলো। ছাগলের বিষয়ে অনুসন্ধান করেও ফলাফল একই হলো। মানুষকে ছাগলের সাথে তুলনা করা হয়েছে এমন কোনো আয়াত পাওয়া গেলো না। মামা তখন বললেন,

- ছাগলের কাছাকাছি কিছু খুঁজে দেখ। এই যেমন ধর চাগল।

মামার কথা শুনে সজিব হেসে ফেলল। চাগল না বলে যদি তিনি টাগল বলতেন সেটাও হয়তো মেনে নেওয়া যেতো কিন্তু ছাগলের বদলে চাগল খোঁজার কোনো মানে হয় না। তবু সে অভিধানে ছ এর বদলে চ অক্ষর দিয়ে খুঁজতে শুরু করলো। খুঁজতে খুঁজতে একটি স্থানে এসে হঠাৎ থেমে গেলো। কিছুক্ষণ ধরে বিড়বিড় করে কিছু একটা পড়লো তারপর চিৎকার করে বলল,

- পেয়ে গেছি মামা পেয়ে গেছি।

- কি পেয়েছিস?

- চতুষ্পদ জন্তু।

মামা যেনো বিরক্ত হলেন।

- খুঁজতে গেলি গরু-ছাগল আর পেয়ে গেলি চতুষ্পদ জন্তু এটা কি খুশির ব্যাপার হলো?

সজিব মামাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলে,

- ছোট বেলায় গরুর রচনা লেখোনি? গরু একটি গৃহপালিত প্রাণী। উহার একটি মাথা চারটি পা এই সব?

মামা উদাসভাবে বলেন,

- তাই তো বটে।

সজিব বলতে থাকে,

- সে হিসেবে গরু ছাগল তো চতুষ্পদ জন্তুই তাই না? এমনও তো হতে পারে যে, কুরানিক চশমায় গরু-ছাগল দিয়ে আসলে চতুষ্পদ জন্তুর কথা বলা হচ্ছে?

মামা এবার বিষয়টি বুঝতে পারেন আর সাথেই বলে ওঠেন,

- কুরআনের কোথাও কি মানুষকে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তূলনা করা হয়েছে?

সজিব কোনো উত্তর না দিয়ে পড়তে থাকে,

- ওরা চতুষ্পদ জন্তুর মতো বরং তদাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

মামা অবাক হয়ে বলেন,

- ওরা কারা?

সজিব এবার অন্য একটি আয়াত পড়ে,

- যারা অবিশ্বাস করে তারা দুনিয়াতে চতুষ্পদ জন্তুর মতো (নিশ্চিন্তে) আমোদ ফূর্তি করে অথচ শেষ পরিণামে তাদের বাসস্থান হলো জ্বলন্ত আগুন।

আয়াতটা শোনার সাথে মামা গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে যান। চতুষ্পদ চন্তুকে জবাই করার জন্য লালন পালন করা হয়। ভালো খেতে দেওয়া হয়। আর তারা নিশ্চিন্তে খানা পিনা করতে থাকে। শীঘ্রই যে তাদের জবাই করা হবে সে বিষয়ে তাদের অন্তরে সামান্য পরিমাণ ভয় ভীতি থাকে না। জান্নাত-জাহান্নামকে অস্বীকার করে দুনিয়ার জীবন নিয়ে যারা মেতে থাকে তারা এমনই। দুনিয়াতে নিশ্চিন্তে ঘুরাফিরা করে অথচ এখনই মৃত্যুর বরণ করলে তাদের জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। অস্ফুট স্বরে মামা বলে ওঠেন,

- কি সুন্দর উপমা!

মামার চেহারার দিকে এক পলকে তাকিয়ে থাকে সজিব। হঠাৎ যেনো মনে হয় মামার চেহারায় অদ্ভুদ পরিবর্তন আসছে। কেনো জানি তার মনে হয় তার মামা হয়তো এবার গরু থেকে মানুষ হতে পারবেন। কিন্তু সে কি পারবে ছাগলের রুপ থেকে বের হতে? মামার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বলে,

- মামা এখন বলো কিভাবে আমরা মানুষ হবো?

সজিবের দিকে দৃষ্টি ফেলে মামা বলেন,

- বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে।

মামার কথা সজিব ঠিক বুঝতে পারে না।

- কিসের উপর বিশ্বাস স্থাপন?

- নাস্তিক হয়ে যা কিছু অবিশ্বাস করেছি তার সবই বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ-রসুল, কুরআন-হাদিস, জান্নাত-জাহান্নাম এই সব।

সজিব অবাক হয়ে বলে,

- তুমি কি এসবে বিশ্বাস করো?

- আগে করতাম না কিন্তু এখন করি। মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। কুরআন যা বলে তার এক বর্ণও আমি আর অবিশ্বাস করি না।

সজিব মামার কথায় সম্মতি জানিয়ে বলে,

- তুমি ঠিকই বলেছো মামা। কুরআনের কথা কখনও ভুল হতে পারে না। আমিও আজ থেকে নিশ্চিতভাবে এসব বিশ্বাস করি।

হঠাৎ সজিবের কানে মামার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

- বাহ! তোর চেহারাটা কি সুন্দর লাগছে!

কথাটা শুনে সজিব মামার দিকে তাকিয়ে দেখে মামা কুরানিক চশমা চোখে দিয়ে তাকে দেখছেন। এবার নিশ্চয় তিনি তাকে মানুষ রুপেই দেখছেন, ছাগল রুপে নয়। সজিবও নিশ্চিত যে তার মামাকে এবার গরুর বদলে মানুষ রুপেই দেখা যাবে। তবু সে একবার পরখ করে দেখতে চায়। চশমাটা চোখে দিয়ে মামার দিকে তাকায়। মামা মুচকি হেসে সজিবের দিকে দৃষ্টি দেন। সাথে সাথে সজিবের মুখ থেকে অস্ফূটভাবে বের হয়ে আসে,

- অদ্ভুদ তো!

কথাটা শুনেই মামা ভয় পেয়ে যান। তার চেহারা কি এখনও গরুর মতোই আছে? তিনি মুখ কালো করে বসে থাকেন সজিবকে কিছুই প্রশ্ন করে না। প্রশ্ন করার দরকারও হয় না। সজিব চশমাটা খুলেই বলে,

- মামা তোমাকে কি সুন্দর লাগছে?

মামা হালকা হেসে বলেন,

- মানুষের মতো?

সজিব মাথা নেড়ে বলে,

- ফেরেশতার মতো।

কথাটা শুনে মামা যে কি খুশি হলেন তা বলার নয়। কুরানিক চশমাটা নিয়ে একবার চুমু খেলেন। তারপর বললেন,

- এবার তো সব রহস্যের সমাধান হয়েই গেলো। চশমাটা এবার আমি ভেঙে ফেলবো।

সজিব অবাক হয়ে বলে,

- কেনো মামা?

- মানুষের গোপন খবর জেনে আমাদের কি লাভ?

সজিব অনুনয় করে বলে,

- না মামা। তুমি চশমাটা ভাঙতে পারবে না। কিছুতেই আমি তোমাকে ভাঙতে দেবো না।

কথায় বলে মামা বাড়ির আবদার। একমাত্র ভাগ্নের এমন আবদারে মামার মনটা তাই না গলে থাকতে পরলো না। মামা চশমাটা সজিবের হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

পরের সপ্তাহে জুময়ার নামাজে মামা-ভাগ্নে একটু আগে ভাগেই হাজির হলো। মামা মসজিদের এক কোনে চোখ বুজে বসে থাকলেন। তিনি মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কিছু বলছিলেন। দু একটা শব্দ সজিবের কানে আসে। মামা এবার সত্যিকার যিকির করছেন। যথা সময়ে ইমাম সাহেব বক্তব্য দিতে শুরু করলো। সজিব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো ইমাম সাহেবের উপর তার আগের মতোই ঘৃণা রয়েছে। আর তার কথা শুনতে আগের মতোই বিরক্তি লাগছে। অথচ এখন তার অন্তরে ইসলাম আর কুরআনের উপর অগাধ ভালবাসার জন্ম নিয়েছে। তবে কি এই ইমাম সাহেব ইসলাম আর কুরআন থেকে দূরে? সেকি তবে মতি হাফেজের মতো গাধা অথবা মুহতামিম সাহেবের মতো ড্রাগন টাইপের কিছু। ইমাম সাহেবের প্রকৃত রুপ দেখার জন্য তার মনটা আকুপাকু করতে থাকে। চশমাটা চোখে রাখতেই তার সামনে ভেসে ওঠে ভয়ংকর একটা ড্রাগন। যার নাক মুখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছে। ড্রাগনটি লম্বা জিব বের করে সেই আগুন চেটে চেটে খাচ্ছে। নিজের অজান্তেই সজিব বলে ওঠে,

- কি ভয়ংকর! কি কুৎসিৎ।

চশমাটা খুলে সজিব কেবলই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে থাকে। ইমাম সাহেবের কোনো কথা তার কানে ঢোকে না। সে ভাবে,

- কি এমন অপরাধ করেন এই ইমাম সাহেব যে কারণে তার এই হাল?

তার মনে পড়ে দুটি কারণে কুরআনে আগুন খাওয়ার কথা বলা আছে। এতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করার কারণে আর কুরানের আয়াত গোপন করে সুবিধা ভোগ করার মাধ্যমে। সে জানে এই ইমাম সাহেব কোনো এতীম খানায় চাকুরী করেন না। তিনি কেবলই এই মসজিদে ইমামতি করেন। তার মানে এতীমের সম্পদ চুরি করার কারণে নয় বরং মসজিদের মিম্বারে বসে হক কথা না বলার কারণে তার এই হাল হয়েছে। সজিবের অন্তরে ইমাম সাহেবের প্রতি তীব্র ঘৃণা বাসা বাধে। এমন একজন ব্যক্তির পিছনে নামাজ পড়তে ইচ্ছা হয় না তার। কিন্তু সে কোথায় নামাজ পড়বে? সবগুলো ইমামই তো একই রকম। তাদের উপর রাগ করে মসজিদ থেকে বের হয়ে গিয়ে তো আর নিজের ক্ষতি করা যাবে না। এমন ভেবে খুব কষ্ট করে সজিব এই ভয়ংকর এবং কুৎসিৎ ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করে।

বাড়ি ফিরে চশমাটি মামার হাতে তুলে দিয়ে বলে,

- চশমাটি ভেঙে ফেলাই উচিৎ।

মামা অবাক হয়ে বলেন,

- কেনো রে?

- প্রতিটি মানুষের প্রকৃত রুপ কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন। আমল অনুযায়ী তাদের বিচারও করবেন। আগে থেকে সেটা জেনে নিয়ে অকারণে নিজেদের কষ্ট বাড়িয়ে কি লাভ?

এর মধ্যে কষ্টের কি আছে মামা সেটা বুঝতে পারেন না। তবে সজিবের হাত থেকে চশমাটি নিয়ে একবার চুমু খেয়ে পকেটে রাখেন।

সজিব অবাক হয়ে বলে,

- কী হলো?

মুচকি হেসে মামা বলেন,

- এর মধ্যে কুরআন আছে। এটা ভাঙবো কিভাবে? তারচেয়ে একটি বাক্সে রেখে তালা মেরে গভীর জঙ্গলে পুতে রেখে আসবো। যাতে কেউ এটা হাতে না পায়।

সজিব মনে মনে হাসে। সে জানে মামার সম্পূর্ণ কথাটা সত্য নয়। তিনি চশমাটি বাক্সে ভরবেন, তালাও হয়তো মারবেন কিন্তু গভীর জঙ্গলে পুতে রেখে আসবেন না। আশেপাশে কোনো গভীর জঙ্গলই নেই। হয়তো তার ল্যাবরেটরীতেই কোথাও রেখে দেবেন। হয়তো কোনো প্রয়োজনে আবারো তিনি চশমাটি বের করবেন। কয়েকজন ভন্ড লোকের প্রকৃত রুপ প্রকাশ করে দেবেন। যাই হোক, সজিব এখন আর এসব বিষয়ে আগ্রহ বোধ করে না। চিড়িয়াখানায় যে চাকুরী করে বন্য পশু দেখতে তার আনন্দ লাগে না। যেখানে প্রতিটি মানুষই পশু সেখানে মানুষের প্রকৃত রুপ বের করে আলাদা তৃপ্তি পাওয়ার সুযোগ কোথায়?

< সমাপ্ত >

লেখকের অন্যান্য বই

গবেষণা গ্রন্থঃ

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বলালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত ('হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!" বইয়ের জবাব)
১৭. একটি অসম বিতর্কের সুষম সমাধান
১৮. সাহু সিজদা
১৯. কুরআন, হাদীস ও চার মাযহাবের মতামতের আলোকে সহজ ফারায়েজ

রিসালাহ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ)ঃ

২০. ছোটদের আক্বাইদ
২১. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল
২২. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২৩. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)
২৪. সংশয় নিরসন (জিহাদ সম্পর্কিত)

ইসলামী উপন্যাসঃ

২৫. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন)
২৬. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)

২৭. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)
২৮. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
২৯. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
৩০. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
৩১. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)
৩২. বায়াত (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)
৩৩. কুরানিক চশমা

কবিতা গ্রন্থঃ

৩৪. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
৩৫. কল্পনায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের জীবন সম্পর্কে কল্পনা)
৩৬. কবিতায় জাহান্নাম (কবিতার ছন্দে জাহান্নামের শাস্তির বিবরণ)
৩৭. ভন্ড হুজুর (কবিতার ছন্দে নামধারী আলেমদের ভন্ডামীর বর্ণনা)

ভাষা শিক্ষাঃ

৩৮. তাইসীরুল ক্বওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)
৩৯. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)